প্রথম প্রকাশ ঃ
—মাঘ, ১৩৬৬

প্রকাশক ঃ
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীরামচন্দ্র দাস
কলিকাতা

প্রচ্ছদ ঃ
প্রবীর সেন

উৎসর্গ

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রীনিত্যানন্দ পালধি
শ্রীবলরাম সরকার

—করকমলেষু

কাকুলার জঙ্গলে

বনের সহস্র চোখ, সহস্র কান। কেউ না কেউ গোয়েন্দার মত লক্ষ্য করছে নয়তো সতর্ক কান পেতে আছে। আত্মগোপন করবার উপায় আছে নাকি!

আসুন, রাতের অন্ধকারেই আমরা যাত্রা করি।

বনমোহিনীর রহস্য উদ্ঘাটন্ করতে হলে রাত্রিই প্রশস্ত সময়। দিন যদি গদ্যময় হয়, তাহলে অরণ্যের রাত্রি যেন হেঁয়ালী-ভরা এক দুর্বোধ্য কবিতা। অবশ্য আপনি যদি অরণ্য-প্রেমিক কিম্বা পক্ষীবিদ অথবা প্রকৃতিবিদ হন, যদি বনের ফুল-পাখী-প্রজাপতি আর উদ্ভিদ-তত্ত্ব বা গাছ-গাছালি অথবা দুর্লভ লতা-গুল্ম নিয়ে গবেষণা করতে ভালবাসেন, তাহলে একটি উজ্জ্বলতম দিন বেছে নিতে হবে আপনাকে।

প্রকৃতির রম্য-কাননে হরেক্-রকম পাখীর সুরেলা কলকণ্ঠ, প্রজাপতির নয়ন-ভোলান রং-বাহার আর আশ্চর্য সুন্দর যত ফুল ফোটে—যাদের সৌরভ ও রঙের বাহার লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রকৃতিকে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন সাজে সাজায়, সুরভিত করে। পাখীর ডাকে সাড়া জাগানো সেই বিচিত্র অরণ্য— প্রভাতের প্রথম সূর্যালোকে আপনার মুগ্ধ অনুসন্ধিৎসু মন কেড়ে নেবে। বিস্ময়ের আর সীমা থাকবে না। এমন আশ্চর্য-বোধ জীবনে আর হয়নি, এ প্রত্যয় আপনার উপলব্ধিতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নিস্তব্ধ দুপুরে ঝরা-পাতার মর্মর শব্দ, নুড়িতে-নুড়িত ঠোকাঠুকি লাগিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে কল্‌কলিয়ে ছুটে যাওয়া ছোট্ট ঝরণা, আর-বাতাসের বেগে পাখীর কাকলি-ভরা গাছের পাতার ঘুলঘুলির ফাঁকে ফাঁকে সর্‌সর্‌-ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ আপনার মনের গভীরে কখন যে এক আশ্চর্য ভাব-তরঙ্গ সৃষ্টি করবে, তারও হদিস্ পাবেন না। ঘুঘু-ডাকা সেই মুগ্ধ দুপুর ঘুম-ঘুম সুরে স্বপ্নের মত চোখের পাতায় এসে ভর করবে!

পশ্চিম আকাশ রাঙিয়ে ক্লান্ত সূর্য দিগন্ত রেখায় যখন আবীর রঙে ডুবুডুবু, গাছের ছায়ার দীর্ঘ গভীর রং যখন ক্রমে মিলিয়ে আসবে, ঠিক তখনই আলোর গভীর থেকে উত্তর-পশ্চিমাকাশে ফুটে উঠবে নিঃসঙ্গ অস্পষ্ট সন্ধ্যা-তারা

সেই বর্ণালী গোধূলি লগ্নে বনের আশ্চর্য নীরবতা ভঙ্গ করে পাখীরা ক্লান্ত স্বরে বিদায়ী ডাক ডাকতে ডাকতে উড়ে যাবে সু-উচ্চ গাছের মাথায়, যেখানে ওদের নীড় বাঁধা আছে। সেই বিষণ্ণ সুরে সুর মিলিয়ে লাল-ঝুঁটি বন-মোরগ দিনের শেষ-দানা বা কোন অসতর্ক পোকা-মাকড় সংগ্রহ করে ভাঙ্গা-গলায় বিদায় জানাবে একটি রৌদ্র-দগ্ধ সু-দিনকে। এর অল্পক্ষণ পরেই যখন ছায়া নিবিড় হয়ে উঠবে, আকাশের ম্লান আভাটুকু ধূসর অন্ধকারে হারিয়ে যাবে, ঠিক তখনই কোন নিভৃত কুণ্ডের শীতল জলে চকিতে ঠোঁট ডুবিয়ে মৌন অরণ্যের স্তব্ধ উদাস বাতাসের ধৈর্যে শিহরণ তুলে ডেকে উঠবে ময়ূর, মাও-মাও-মাও···! সেই তীক্ষ্ণ শিহরণ-জাগা সুদূর-প্রসারী সুরেলা ডাকই ঘোষণা করে একটি দিনের প্রকৃত অবসান।

সে এক আশ্চর্য মুহূর্ত! দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ, এমন মধুর মিলন মুহূর্তে—পট-পরিবর্তনের সেই নৈসর্গিক শোভা বুঝি আর কোথাও এমন করে প্রত্যক্ষ করা যায় না। শিরায়-শিরায় অনুভূতির এক রমণীয় চমক ও বিস্ময় যুগপৎ খেলে যায়। যারা দিনের আলোয় নির্ভয়—তারা সবাই তখন ঘর-মুখো, সকলেই ব্যস্ত-সন্ত্রস্ত। দ্রুত আত্মগোপনে তৎপর যে যার গোপন ঠিকানায়। আসন্ন অন্ধকারের ভয়ে ভীত, অসহায়! প্রকৃতির দুটি রূপ, আলো ও অন্ধকার দিনের অরণ্য যেমন বিস্ময়ে মুগ্ধ করবে, তেমনি রাতের অন্ধকার অজ্ঞান শিহরণে কাঁপিয়ে তুলতেও দ্বিধা করবে না। আলোর যখন শেষ, অন্ধকারের তখনই শুরু।

রাতের সেই নিকষ কালো অন্ধকার মাড়িয়ে মাড়িয়ে চুপিসারে সতর্ক পা ফেলে সন্তর্পণে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করবে নিশাচর প্রাণীরা। নিঝুম অরণ্যের সেই মৌন নৈশ-আসর প্রথমে ভরিয়ে তুলবে ঐকতানের সুরে ঝিঁঝিঁর-ডাক. একটানা বেজে চলবে সেই সুর-ঝঙ্কার—ঝিম্-ঝিম্-ঝিম্-ঝিম্······। সেই ডাক শুনে মোটা-গলার কীট-পতঙ্গেরা উল্লাসে গালফুলিয়ে সুর তুলবে কট্-কট্, কিট্-কিট্, টি-টি-টি অথবা গ্যাং-গ্যাং-গ্যাং। অরণ্য-বাসর যখন জম-জমাট তখনই হয়তো কোন কোটর-নিৰ্গত ক্ষুধার্ত প্যাঁচার কর্কশ স্বরে অকস্মাৎ ছন্দ-পতন ঘটবে সেই আরণ্যক অর্কেষ্ট্রার। নিশ্চুপ-নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে তখন উৎকণ্ঠায় থমথম করবে বন, একটা সূঁচ পড়লেও বুঝি শোনা যাবে—এমনি নিস্তব্ধ। সেই স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে তীব্র-স্বরে হঠাৎ ডেকে উঠবে নাইট্‌জার—টিটি-হু'টু, টিটি-হু'টু······যেন 'অরণ্যের পাগলা মেহের আলী' ভুতুড়ে-গলায় সাবধান বাণী উচ্চারণ করলো—

তফাৎ যাও, তফাৎ যাও। সেই আকস্মিক হুঁসিয়ারী শুনে সাড়া পড়ে যাবে বনের গভীরে, দূর-দূরান্ত থেকে ভেসে আসবে প্রহরী-প্রাণীদের সতর্ক-সূচক সঙ্কেত-ধ্বনি। কেউ কুকুরের মত চিৎকার করে উঠবে, কেউ ঘণ্টার মত ধ্বনি তুলবে, আবার কেউ ডেকে উঠবে টাউ-টাউ-টাউ......।

ধীরে ধীরে জেগে ওঠে রাতের অরণ্য! শব্দ আর নৈঃশব্দের গভীরে রিপু-তাড়নায় চঞ্চল হয়ে ওঠে আরণ্যক-প্রবৃত্তি। সেই ভয়ানক বন্যতায় থম্‌কে-থাকা অন্ধকার যেন কোন চকিত ইসারায় দুলে-দুলে ওঠে। পাতায় পাতায় গোপন কানা-কানি, ছায়ায়-ছায়ায় চলে ষড়যন্ত্র, কুটিল ভয়াল হয়ে ওঠে অরণ্যের গভীর সুঁড়ি-পথ। অন্ধকার নালা থেকে ভেসে আসে উত্তেজিত স্বর চিক্‌-চিক্, চিক্-চিক্, পরক্ষণেই হয়তো শোনা যাবে আর এক অনুরাগী-কণ্ঠ—একটানা ডেকে যাবে কুক্-কুক্-কুক্-কুক্। তখনই হয়তো বনের আর এক প্রান্তে গাছের ডালে মোচড় দিয়ে পাকে পাকে নেমে আসবে কোন ক্ষুধার্ত ময়াল। ঘাসের চাব্‌ড়ায় অথবা ঝোপের অন্ধকার কোণে কুণ্ডলী পাকিয়ে ফণা উঁচিয়ে ধরবে বিষধর। পায়ের খুর ঠুকে-ঠুকে আসবে সন্ত্রস্ত হরিণ, সম্বর আর সদা-সতর্ক কোট্‌রা—বনের প্রহরী। বুনো দাঁতাল ব'রা শিকড়ের (মূলের) সন্ধানে ফালা-ফালা করবে মাটি, মত্ত-চালে হেলে-দুলে যাবে ভালুক উই-ঢিবি বা পাকা ডুমুর অথবা বট-ফলের লোভে। তখন নিঃশব্দে টহল্ দেয় নেকড়ে-হায়না-শিয়াল, আর আড়ালে-আব্‌ডালে চকিতে তৎপর হয়ে ওঠে অপেক্ষাকৃত বড় মাংসাশী প্রাণীরা। সেই ভীষণ বন্যতায় থর্‌থর্ করে কাঁপে রাতের প্রথম-প্রহর।

প্রকৃতির বুকে আশ্চর্যের কোন ঘাট্‌তি নেই! হয়তো এ-হেন ভয়ঙ্কর মুহূর্তে শুনতে পাবেন কোন সুরেলা কণ্ঠের মিলন-আহ্বান, আবার পরক্ষণেই সচকিত করে ভেসে আসবে মৃত্যুর আতঙ্ক ছড়ানো কোন হুঁসিয়ারী শব্দ। বিপরীত-ধর্মী দুটি সুরের যুগপৎ ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে রুদ্ধশ্বাসে স্তম্ভিত হয়ে থাকে বন। দূর-দূরান্ত থেকে ভেসে আসে সেই ডাক, বিচিত্র সে ডাকের বহর! দুড়-দাড় করে বন-বাদাড় ভেঙ্গে কেউ পালায় প্রাণ-ভয়ে, আবার কেউ দ্রুত-চালে এগিয়ে আসে দুরন্ত বন্য-আবেগে মিলন আকাঙ্ক্ষায়। তখন শুরু হয় শব্দের গভীরে শব্দের প্রতিধ্বনি, সুরু হয় উত্তর আর প্রত্যুত্তরের এক বিচিত্র সমারোহ! কখন সে সুর দূরাগত, আবার কখন বনের কোন নিভৃত কুঞ্জে মিলন-তৃষ্ণায় মুখরিত—আবার কখন সে সুরে ঘটে আকস্মিক ছন্দ-পতন। অপ্রত্যাশিত মৃত্যু ঝাঁপিয়ে পড়ে অতর্কিতে, কাতর আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ে সকরুণ সুরে অরণ্যের গভীরে—

পাহাড়ে-কন্দরে। মুহূর্তে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে অরণ্যের বিষণ্ণ-বাতাস, তব্
কোথাও কোন ব্যতিক্রম নেই। ভেবে অবাক হবেন প্রকৃতির বুকে কো
অনুভূতি নেই, কোন দুঃখও নেই! জীবন ও মৃত্যু দিয়ে উদাসীন প্রকৃ
নির্লিপ্তের মত অরণ্যের ভারসাম্য হয়তো এ-ভাবেই বজায় রাখে।

এ সেই সময়—পূর্বেই বলেছি, অরণ্যকে উপলব্ধি করতে হলে রাত্রিই প্রশ
সময়। পথে যদি উজালা ফুটে ওঠে, বন যদি মোহিনী-সাজে চঞ্চলা হয়—কাঙা
নয়ন মাথা খুঁড়ে মরে মরুক, মন তুমি ভুল না, রাইফেলটাকে বাগিয়ে ধ
'রসে-বসে' থেক। ঠোঁটে-পেয়ালায় বিস্তর ফাঁকি······!

অরণ্যও তার নিজের নিয়মে চলে, সে নিয়ম আবার প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত। ত
কখন-কখন সে নিয়মেরও ব্যতিক্রম ঘটে থাকে। অনেকদিন আগে নিয়মে
এমনি এক ব্যতিক্রম ঘটেছিল 'বাক্‌লার-জঙ্গলে।' আমি তখন উড়িষ্যার দুর্গাপুর
ব্লকে শিকার করছিলাম। ঘটনাচক্রে বনমোহিনীর রহস্যে জড়িয়ে পড়ি এব
এমন এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি যা ইতিপূর্বে আর কখন হয়নি।

একদিন 'বাক্‌লার' গভীর বন থেকে আমার আস্তানা দুর্গাপুর ডাক্‌বাংলো
ফিরে আসছিলাম। সময় তখন রাত্রির তৃতীয়-প্রহর, সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জা
না—সেদিন ঘুটঘুটে অন্ধকারের পরিবর্তে ফুটেছিল ফুটফুটে জ্যোৎস্না। সে
পাগল-করা রূপে মুগ্ধ হয়ে বনের পথ হারিয়ে বসলাম। পরিণাম কত সাংঘাতি
হতে পারে তা আদৌ মনে স্থান পায়নি, গুলিভরা রাইফেলটা বাগিয়ে শু
অসাড় দম্ভই করেছিলাম। অচিরেই তার ফল পাওয়া গেল।

আমার স্থানীয় সঙ্গী চূড়ামণির অনুপস্থিতিতে সে রাতের গাইড অর্থাৎ পথ
নির্দেশক ছিল হলধর, সেও জংলী। এ জঙ্গলের সবকিছু তারও নখ-দর্পণে, তব
যে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে পথ হারিয়ে বসলাম, হলধরের মত মানুষ, যে জীবনে
এতগুলো বছর জঙ্গলের অলিতে-গলিতে হেলায় অতিবাহিত করেছে, ভ
দিশেহারা হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। সে কথা সবিস্তারে যথাসময়ে বলছি। পথ
হারিয়ে সেদিন হলধর কেমন হতভম্ব হয়ে পড়ল। কিছুতেই পথের হদিস্ ঠিক করতে
পারছিল না, তার মাথার মধ্যে সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। পাগলের মত
যেখানে-সেখানে পথ হাতড়াতে লাগলো। ক্রমে সে অবসন্ন হয়ে পড়ল, শরীরে
বিকারের লক্ষণ ফুটে উঠলো, শেষে ভয়ে কাঁপতে লাগলো ম্যালেরিয়া রুগীর
মত। চোখের তারায় তখন আতঙ্ক ফুটে উঠেছে, জড়ানো গলায় বললো—
মোহিনী! ক্রমে স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল, লোকটি বোধ হয় ভয়েই মারা পড়বে!

গুলিভরা রাইফেল বাগিয়ে ধরে চতুর্দিকের ঝোপ-ঝাড়, অলি-গলি, বনের গভীর সুঁড়ি-পথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখলাম। আমার চতুর্দিক তখন জ্যোৎস্নার রজত-ধারায় ঝলমল্ করে উঠেছে, ভরা-পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র তখন আকাশের আর একপ্রান্তে হেলে গেছে। ভোর হয়েছে ভেবে ঘুম-ভাঙা পাখীদের অস্পষ্ট কূজন ভেসে আসছিল, কখন-কখন চিতল-হরিণের দূরাগত ডাক শ্রুতিগোচর হচ্ছিল। এ ছাড়া আর কোন অস্বাভাবিক শব্দ শোনা যায় নি, আতঙ্কিত হবার মত কিছুই নজরে আসে নি। চৈতি-বাতাস বনের গোলক্-ধাঁধাঁয় ক্লান্ত শ্বাস ফেলে যাচ্ছিল গাছের-পাতায়, ঘাসের-বনে আর শুকনো পাতার মর্মরে……। কারা যেন ফুঁপিয়ে উঠল, কারা যেন হতাশার শেষ শ্বাস ফেলে গেল! বিপদের গুরুত্ব ক্রমশই হৃদয়ঙ্গম হচ্ছিল, কেমন ভয়-ভয় করতে লাগলো। সেই রাত দুপুরে নির্জন বনে পথ হারিয়ে গা ছম্‌ছম্-করা কোন অশরীরির আবির্ভাব যেন অনুভূত হতে লাগলো। ঘন পাতার আড়াল থেকে, ঝোপের অন্ধকার থেকে, জ্যোৎস্নার গভীর থেকে কে বা কারা যেন কৌতূহলে উঁকি দিচ্ছে। কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, অথচ চোখ সরিয়ে নিলেই মনে হয়—আছে, সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে মনের অনুভূতিতে নিঃশব্দে ঘোষণা করে তাদের কায়াহীন উপস্থিতি! হলধরের মত আমিও বার-বার চমকে উঠতে লাগলাম, কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে, কে যেন ইসারায় ডেকে গেল! জ্যোৎস্নার আলোমাখা কোন্ মায়াবীর শুভ্র ওড়না যেন শূন্যে ভেসে গেল!

সাপের স্বচ্ছ সম্মোহনী দৃষ্টি থেকে যেমন অসহায় ক্ষুদ্র প্রাণীরা পালাতে পারে না, ভয়ে অবশ হয়ে পড়ে। ঠিক তেমনি আমার সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল, কি এক আশ্চর্য প্রভাব চেতনাকে পঙ্গু করে ধীরে ধীরে গ্রাস করবার উপক্রম করতে লাগলো। মাথার ওপর আলোকিত নীলাকাশ থেকে জ্যোৎস্নার যেন ঢল্ নেমেছে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না-ধারা অসংখ্য তীরের মত মাটি ফুঁড়ে রয়েছে। বিচিত্র সেই ভঙ্গিমা! আলো-ছায়ার এমন মায়াময় বিভ্রান্ত-করা রূপ পূর্বে কখন এমনভাবে দেখিনি। হলধরের পাশে মুগ্ধ-বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করলাম পথের কোন হদিস্ করতে পেরেছে কিনা! কোন জবাব নেই, কতক্ষণ পরে আড়ষ্ট গলায় হঠাৎ সাড়া দিয়ে উঠলো, 'আজ্ঞা'! কে প্রশ্ন করেছিল, কে জবাব দিল? যেন আমার প্রশ্নের নয়, আর কারুর কোন অশ্রুত জিজ্ঞাসার উত্তর কোথা থেকে ভেসে এল—আজ্ঞা! হলধরের কণ্ঠ নয়, আমার চতুর্দিকে তির্যক-ভঙ্গিমায়

ছড়িয়ে থাকা জ্যোৎস্নালোক থেকে, কিম্বা পাতার ঘুলঘুলি থেকে, নয়তো অরণ্যের গভীর থেকে বিবশ রজনীর তৃতীয় প্রহর স্খলিত স্বরে যেন স্বগতোক্তি করে উঠলো। সমস্ত বন যেন চমকে ফিরে তাকালো! কারা যেন ফিস্‌ফিসিয়ে উঠলো পাতায়-পাতায়, তারপর বীভৎস শব্দ করে হেসে উঠলো, হা-হা-হা-হা··· ।

বিচিত্র রাত্রির রূপ, বিচিত্র তার ইতিকথা! কত বিনিদ্র রজনী অরণ্যে যাপন করেছি, কিন্তু সে-রাতের কোন তুলনা নেই। ভয়ঙ্কর সেই রাত্রির পার্থক্য, ঘুটঘুটে অন্ধকারের পরিবর্তে ফুটেছিল ভরা-পূর্ণিমার ফুটফুটে জ্যোৎস্না। আসুন—আজ আবার সেই পুলকিত রজনীর জ্যোৎস্নালোকে যেতে যেতে 'বনমোহিনী'র সেই কাহিনী সবিস্তারে আপনাকে শোনাই—

সেদিনও এমনি জ্যোৎস্না ফুটেছিল!

'এমন চাঁদের আলো—মরি যদি সেও ভালো'—বলে তো বেরিয়ে পড়লাম। এ তো আর নির্জন-সৈকতে নৈশ-বিহার নয়, গাঁয়ের নদী-তীরে নিঃশঙ্ক প্রমোদ ভ্রমণও নয়। শিকারীর পথ চিরকালই দুর্গম, মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা কষতে-কষতে সে পথে পাড়ি দিতে হয়। তা—সে পথ ঘুটঘুটে অন্ধকারই হোক্ অথবা ফুটফুটে জ্যোৎস্নাই হোক্—দুই-ই সমান বিপজ্জনক। তখন যে পথে পাড়ি দেব, সে পথ আবার শ্বাপদ-সঙ্কুল গভীর অরণ্য পথ। চাঁদের আলোয় অবশ্য লুটোপুটি খাচ্ছিল। নীরব নিস্তব্ধ গভীর অরণ্যের বুকে পূর্ণিমার চাঁদ যতই রমণীয় করে তুলুক রূপসী রাত্রিকে, তবু উন্মনা রাত্রি চির-উদাস—কি সংশয়ে, কি দ্বিধায় যেন বিড়ম্বিত, কি না-পাওয়ার ব্যথায় যেন স্তব্ধ-নিঝুম! পূর্ণিমা-রাত গভীর অরণ্যে যে রমণীয় দৃশ্যের অবতারণা করে, তার কোন তুলনা নেই। সে রূপ যেমন স্বপ্ন দেখায়, তেমনি প্রমাদও ঘটায়। সর্বনাশের ইঙ্গিত-ভরা সে রূপের হাতছানি, দিবানা-মন পতঙ্গের মত সুখে পুড়তে চায়!

শেষ-রাতের সেই জ্যোৎস্নালোকে পাখীরা ভুল করে ডানা ঝাপ্‌টিয়ে ডেকে উঠেছে। বিভ্রান্ত হয়েছে বনের হরিণ-চিতা আরও কত নিশাচর। চিতার চোখে অকাল্-ঊষার বিস্ময়, আর তৃণ-মুখে বিভোর হরিণ কাজল-কালো চোখে আকাশের পানে মুখ তুলেছে। গাছের পাতায় পাতায় আলোর ঝক্‌ঝকে প্রতিফলন। স্তব্ধ-বিভোর অরণ্য-সঙ্কুল পাহাড়-প্রান্তর, অপার্থিব সুখে রূপ-সাগরে ডুব দিয়ে তন্ময়। ঝির্‌ঝিরে বাতাস এসে স্বপ্নের সেই জগতকে স্বৈরিণীর মত আরও নিবিড়, আরও রহস্যময় করে তুলেছিল।

এমন রাতে দিক্‌-ভ্রম হওয়া কিছু বিচিত্র নয়, এ-রাত সব ভুলিয়ে দেয়। হৃদয়

যতই উদ্বেল হোক, সামান্য অসতর্ক হলেই তীক্ষ্ণ নখ-দন্তের জ্বালায় কবিত্ব করা জন্মের মত ঘুচে যাবে। অতএব চোখে-কানে সজাগ হয়ে আর গুলিভরা ৪৫০/৪০০ বোরের দো-নলা রাইফেলটা শক্ত-হাতে ধরা। জঙ্গলের সঙ্গী চূড়ামণির অনুপস্থিতিতে সে রাতের গাইড্ হলধর আমার পাঁচ-সেলের টর্চ, জলের-বোতল ও তার নিজস্ব টাঙ্গি হাতে নিঃশব্দে চলেছে বনের পথ দেখিয়ে। কথা নেই—প্রথমত বলতে মানা, দ্বিতীয়ত ভয়ঙ্কর-সুন্দর পরিবেশের প্রভাব। ভাষাহীন, শব্দহীন রূপসী রাত্রি সেদিন ভরা-পূর্ণিমায় অভিসারে মেতেছিল। রহস্যময়ীর অবগুণ্ঠন-তলে কি দুরভিসন্ধির অভিলাষে কুঞ্চিত ভ্রূকুটি স্তব্ধ হয়েছিল জানি না।

দূরে কোথায় বন-মোরগ ঘুম-চোখে অস্পষ্ট ‘কক্-কক্’ শব্দ করে উঠলো। মাটি থেকে আচমকা তিত্-খচ খচ্—তিত্-খচ খচ্ ডাকতে ডাকতে তীর বেগে উড়ে গেল বন-তিতির। গাছের ডালে ডানা ঝাপ্‌টিয়ে উঠলো ঘুম-ভাঙ্গা কোন পাখী, ঘাসের বনে টাউ-টাউ করে ডেকে উঠলো কোন বিভ্রান্ত হরিণ। চমকের পর চমক উঠছিল। পথ, বে-পথ সব একাকার—যে সুঁড়ি-পথ ধরে তখন আমরা ফিরে আসছিলাম, তার দু-ধারে যাবার সময় কত খানা-খন্দ দেখেছিলাম, কিন্তু ফেরার-পথে দেখলাম—কে যেন তার ওপর আলোর এক আশ্চর্য প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে। বনের পথে সব প্রাণীই সন্তর্পণে হাঁটে, আমরাও চলেছি সতর্ক হয়ে। শেষ চৈত্রের শেষ-রাত, বসন্ত-বাতাসে তখনও শীতের অনুরাগী স্পর্শ।

সারা-রাত মাচায় কাটিয়েছি, আমার ঈপ্সিত শিকার আসেনি। হাতে-পায়ে খিল ধরে গিয়েছিল, কোমরে টান ধরেছিল। শেষে স্থির করলাম, এই শেষরাতে বাংলোয় ফিরে যাবো চাঁদের আলোয় হাঁটতে-হাঁটতে। আমার ঈপ্সিত শিকারটি একটি চিতাবাঘ। সে বাকুলা-বাসীদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলে নিজের মৃত্যুকে নিজেই ডেকে এনেছিল। নইলে ঠিক সেই সময়েই আমিই বা কেন দুর্গাপুর-ব্লকে এসে হাজির হব, আর বাকুলা-বাসীদের অনুরোধে নিজের শিকার ছেড়ে তাদের উপদ্রব দূর করতে ছুটে আসবোই বা কেন! সে যাই হোক—বনের সুন্দর প্রাণীটি কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম। সে বন থেকে বসতির দিকে নজর ফিরিয়েছিল, নির্দিষ্ট আহারে তার অরুচি। গৃহস্থকে হাঁসটা, মুরগীটা, গরুটা, ছাগলটা যদি নিত্য খোয়াতে হয়, কত আর মুখ বুজে সইবে! খেসারৎ-ই বা দেবে কোন্ মহাজন! সুতরাং চিতাটাকে মারার একান্ত প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল এবং গ্রামবাসীরা তার কোন ত্রুটি

রাখেনি, তবু সেই ধূর্ত চিতাকে মারা সম্ভব হয়নি। সমস্ত কৌশলই ব্যর্থ হয়েছে, শেষে চিতাটাকে মারতে না পারার অক্ষম আক্রোশে তার ওপর যে দুর্নাম বর্ষিত হয়েছিল—তাকে আজগুবি, অবাস্তব বা অলৌকিকও বলা চলে। গ্রামবাসীরা আমায় বলেছিল, জঙ্গলে অনেক দুষ্ট-আত্মা বাস করে, তাদেরই কেউ চিতার ওপর ভর করে গ্রামে এসে উপদ্রব করছে। কেউ কেউ বলেছিল বন্দুক-রাইফেলের গুলিতে তার কোন ক্ষতি হবে না, আগুনই একমাত্র ভরসা। আগুনে না পোড়ালে দুরাত্মার বিনাশ নেই। তা, গ্রামের চতুর্দিকে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিল, পাহারাও জোরদার ছিল—তবু চিতাটাকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হল না। সময়মত খুশিমত সে শিকার সংগ্রহ করতে লাগলো। হৈ-হল্লা, টিন পেটানোর প্রচণ্ড শব্দে শুধু জানা যেত চিতাটা এসেছিল, আর কার ঘরের খোঁয়াড় ভাঙ্গা পড়েছে তা জানা যেত পরদিন, যতক্ষণ না সূর্য বেশ কিছুটা উঠে এসে গোটা অঞ্চলটাকে ঝলসে দিত।

দুর্গাপুর-ব্লকে মনের মত কোন ভাল শিকার না পেয়ে যখন আলস্যে আরণ্যক দিনগুলো একের পর এক কেটে যাচ্ছিল, সেই সময়েই বাকুলা-বাসীদের অনুরোধ এসেছিল। তারপর অনেকদিন কেটে গেছে, পাহাড়ে-জঙ্গলে অক্লান্ত অনুসরণ করেছি কিন্তু গুলির আওতায় তাকে একবারও পাইনি বা আনতে পারিনি। আমার সব প্রচেষ্টাই তখন ব্যর্থ হতে চলেছে, তবু রাতের পর রাত মাচায়, গাছের শুকনো ডালে কাটাতে লাগলাম। সে দুর্দশার কাহিনী পরে বলছি—

উপস্থিত মাচা থেকে নেমে, আলস্য ভেঙ্গে চাঁদের আলোয় বাংলো লক্ষ্য করে তো হাঁটতে লাগলাম। চাঁদের আলোয় তখন ফিনিক ফুটেছে। 'এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভাল'—মনটা মুহূর্তে খুশির পাখা মেলে দিল, শুধু চিতাটা এল না—এইটুকুই যা দুঃখ। খবরে ভুল ছিল, হলধর বলেছিল—চিতাটা একটা ছাগল নিয়ে বনের এ প্রান্তেই প্রবেশ করেছে। বিকাল পাঁচটা নাগাদ এসে মড়িটার (নিহত ছাগলের) খোঁজ-খবর শুরু করেছিলাম, কিন্তু বন তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সন্দেহ হয়েছিল চিতাটা হয়তো মড়ি তুলে নিয়ে অন্য কোন বনে ঢুকেছে, নয়তো একটা দিশী ছাগলকে এক রাতে খেয়ে শেষ করে ফেলার মত খিদে তার ছিল।

যাই হোক—মড়িটা না পেলেও চিতার পায়ের অনেক ছাপ ও আঁচড়ের দাগ দেখে আন্দাজ করেছিলাম, এ বনেই সে বেশী চলাফেরা করে। হয়তো কাছাকাছি কোথাও তার ঘাঁটি রয়েছে। যদি দৈবাৎ কোন সুযোগ এসে পড়ে সেই আশায়

পাহারায় বসেছিলাম, কিন্তু চিতাটা এল না। সে যখন আর একটা নূতন শিকারের সন্ধানে গ্রামের ধারে ঘুর-ঘুর করছিল, আমি তখন আশা-নিরাশায় দুলতে দুলতে গাছের শুকনো ডালে বসে পূর্ণিমা রাতের চাঁদ দেখছিলাম। চিতাটা এতক্ষণে কোন শিকার সংগ্রহে সমর্থ হয়েছে কিনা জানার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কারণ গ্রামের হৈ-হল্লা বা টিন পেটানোর কোন আওয়াজই এতদূর এসে পৌছবে না।

সন্ধ্যা নাগাদ কোটরা-হরিণ ডাকতে লাগলো গ্রামের দিকের জঙ্গল থেকে, ময়ূর ডেকে উঠেছিল আমাদের বাঁ-দিকের বন থেকে, ডান-দিকের বনে হঠাৎ বুনো-শুয়োর ছোটাছুটি আরম্ভ করে দিয়েছিল। আর সন্ধ্যা ঘন হবার ঠিক পূর্বক্ষণে পিছনের জঙ্গল থেকে পাখীদের উত্তেজিত কোলাহল শোনা গিয়েছিল।

চূড়ামণি একদিন বলেছিল, চিতাটা খুবই ধূর্ত। উপরোক্ত ইঙ্গিতগুলো সে-কথারই স্বীকৃতি জানালো। অনেক সাক্ষী রেখে তবে সে এখান থেকে গেছে, অথচ একবারও তাকে চোখের দেখা দেখতে পাইনি। যখন যেমন সে গেছে, বনের সজাগ প্রাণীরা তেমনি-ভাবেই নির্ভুল সঙ্কেত-ধ্বনি ছড়িয়ে দিয়েছে। সব-শেষে তাকে দেখেছিল গ্রামের ধারের জঙ্গলে বিচরণশীল কোন কোটরা, তার ঘন-ঘন হুঁশিয়ারী ডাক আমার কানে পৌঁছেছিল। রাইফেলটাকে বাগিয়ে ধরেছিলাম এই ভেবে যে, চিতাটা হয়তো আর কোথা থেকে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তখন দূরে চলে যাচ্ছিল।

তারপর ধীরে ধীরে রাত বাড়তে লাগলো, বনের চতুর্দিকে নানা শব্দ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। বনের শুকনো কাঠি ভাঙ্গার মত সামান্য অস্পষ্ট শব্দে কতবার রুদ্ধশ্বাসে রাইফেল বাগিয়ে ধরেছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেছে। কখনো হায়না, কখনো বুনো-শুয়োর আবার কখনো হরিণ বা শম্বর আমার ক্লান্ত-দৃষ্টি মাড়িয়ে মাড়িয়ে নিরুপদ্রবে চলে গেছে। কপাল ঠুকে রাত জাগাই সার হল, চিতাটা এল না। শেষে হতাশ হয়ে বসে বসে বন-জ্যোৎস্না দেখেছি আর ভেবেছি, চিতাটা হয়তো ব্যর্থ হয়ে বা গ্রামবাসীদের কাছে তাড়া খেয়ে এ-বনেই আবার ফিরে আসবে। আর যদি কোন শিকারের টুঁটি কামড়ে ধরবার সুযোগ পায়, তাহলে দাঁতে সেই নব-লব্ধ মড়ি ঝুলিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে হঠাৎ আমার সামনে এসে হাজির হবে। তখন টর্চের এক-ঝলক্ আলো ও সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের ট্রিগারে ছোট্ট একটা টানে আমার এ অভিযান শেষ হবে, কিন্তু 'আমি যাব ডাইনে কপাল বলে বাঁইনে'...... ।

অগত্যা মাচা থেকে নেমে কোমর ছাড়িয়ে, হাত-পা টান-টান করে আলস্য

ভেঙ্গে সেদিনের মত বাংলোয় ফিরে আসছিলাম। বড় বড় ঘাসের বুকে যেখানে আলোর ঢেউ খেলছিল, সেই রূপালী-তরঙ্গে যেন সাঁতার কাটতে কাটতে ফিরে আসছিলাম। বাক্‌লা-বাসীরা তখন গভীর নিদ্রামগ্ন, আপদ-বালাই দূর করার দায়িত্ব তো সেই শিকারীর! যারা হৃদয়হীন নিষ্ঠুরের মত শুধু শখ মেটাবার জন্য বা নিছক্ রক্তের নেশায় বন্যপ্রাণী ধ্বংস করছে বলে লোকে গাল পাড়ে। আহা পাড়ুক! যারা বনের উপদ্রুত অঞ্চলের নিরস্ত্র গরীব অরণ্য-বাসীদের দুর্দশার খবর রাখা প্রয়োজন বোধ করে না, নির্মম বাস্তবের মুখোমুখী হবার দুঃসাহস নেই, তারা তো দুষবেই!

দুর্গাপুর ডাক-বাংলো তখনও অনেক দূরে। এই দুর্গাপুর-ব্লকের গল্প 'বাঘ ও বাঘিনী'তে বলেছি। উড়িষ্যার ঢেন্‌কানল জেলার মহকুমা শহর আঙ্গুল (Anugul) থেকে যে সুন্দর পাকা রাস্তাটা বন-জঙ্গল আর ধান-ক্ষেতের পাশ দিয়ে সম্বলপুরের দিকে গেছে, তার বাইশ-মাইল-স্টোনে এই দুর্গাপুর-ব্লক, পুরনাকোট্ রেঞ্জের অধীনে।

সেখান থেকে একটা কাঁচা-রাস্তা ডাইনে মোড় ঘুরে ছোট্ট একটি স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের গা ঘেঁসে গাছ-পালার ফাঁকে ফাঁকে একটা টিলার গায়ে এসে থেমেছে। দূরত্ব যদিও পাঁচ-ছ' মাইলের মত, তবু পথশ্রমের কোন ক্লান্তি বোধ হবে না—যদি সময়টা হয় শীতকাল। দু'পাশের গাছপালায় অসংখ্য পাখীর সুরেলা ডাক শুনতে শুনতে কিম্বা সদ্য-ভূমিষ্ঠ হওয়া কোন চঞ্চল বাছুরের টল্‌টলে পায়ে হঠাৎ ছুটে এসে থম্‌কে দাঁড়ানো, তার পর মুখ বাড়িয়ে আপনার দেহের ঘ্রাণ শোঁকা, নয়তো প্যাণ্টে একটু ঘাড় চুল্‌কে নেওয়া—নয়তো গাভীর শান্ত গভীর হাম্বা-রব শুনতে শুনতে কখন যে পথ ফুরিয়ে যাবে টেরও পাবেন না! কিন্তু গ্রীষ্মকালে যখন রোদের তাপে মাটি ফাটে, ঘাস মরে যায়, পথ নির্জন হয়ে পড়ে, ঘন পাতার ছায়ায় পাখীরা দু-ঠোঁট ফাঁক করে ক্লান্তিতে হাঁফায়—তখন অন্য চেহারা। গরু-বাছুর চলাচলের ফলে ফাটা-মাটি গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যায়, ধুলো ওড়ে। পথ তখন ক্ষত-বিক্ষত, হাঁটু সমান গভীর ধুলোয় ঢাকা। আবার বর্ষাকালে ঠিক বিপরীত চেহারা, হাঁটু-সমান গভীর কাদা ভট্ ভট্ করে—দু'পাশের বনে ঝিঁঝিঁ ডাকে, উইচিংড়ে লাফিয়ে বেড়ায়, নালার জলে ব্যাঙাচিরা শব্দ করে; ব্যাংয়ের ডাকে সমস্ত পথ তখন মুখর হয়ে থাকে। মাছরাঙ্গার অস্থির ডাক শোনা যায়, কাট্‌ঠোক্‌রা ভিজে গাছে শব্দ করে—ঠক্-ঠক্-ঠক্।

যে টিলার গায়ে এই মেঠো-পথ এসে থেমেছে, সেই টিলার মাথায় চমৎকার

ডাক-বাংলোটির অবস্থিতি। টিলার ঠিক নীচেই গ্রাম, গ্রামের নামও দুর্গাপুর। এর পাশ দিয়ে আর একটা পায়ে-চলা পথ এঁকেবেঁকে গেছে জঙ্গলের দিকে, গ্রামের পিছন দিয়ে ডানদিকে মোড় ঘুরে তিরিশ-চল্লিশ গজ ভিতরে গেলেই চোখে পড়বে একটা চমৎকার দীঘি। পরিষ্কার টলটলে জল, ধারে ধারে আগাছা আর শাপ্‌লার বন—সাদা ও গোলাপী রঙের শালুক ফুল ফুটে রয়েছে সেখানে। যতই কাছে যাবেন ততই অস্পষ্ট একটা গুঞ্জন কানে আসবে, গুঞ্জনটা যে পাখীর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকবে না। যদি ভাল লাগে, কৌতূহল বোধ করেন—তাহলে সরাসরি অগ্রসর না হয়ে বরং দুষ্টু শিকারীদের মত সন্তর্পণে বনের আড়াল নিয়ে দেখবেন—মরাল্‌, বেলে-হাঁস, বিগড়ী আর জল-পিঁপিঁরা কেমন নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে আপন-মনে খেলা করছে, কখন ডুব দিয়ে-দিয়ে কখন জলের ঢেউ তুলে তুলে আপনার দু-চোখ ভরিয়ে দিচ্ছে। মনে হবে, এমন একটা শান্ত নিরিবিলি জায়গার জন্য মনটা বুঝি হাঁফিয়ে উঠেছিল, মনে হবে সব ক্লান্তি বুঝি জুড়িয়ে গেল। কেউ না দেখুক—আমি জানি, তৃপ্তির একটা দৃপ্ত ছটা আপনার দু-চোখের মুগ্ধ তারায় ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠবে, যে অনুভূতি অনাস্বাদিত ছিল কতকাল!

টিলার ঠিক পিছন থেকেই কিন্তু জঙ্গলের শুরু, এর বিপরীত দিকের পথের ধারে জানকী, হলধর ও চূড়ামণিদের বাড়ি। ভগবতী যদি আজও বেঁচে থাকে তো ওর মুখেই শুনবেন, সেবার ওর মেয়েকে কোথায় হায়না ধরেছিল। আর কোথায় সেই শিশু-খেকো হায়নাটাকে মারা হয়েছিল। জঙ্গল ক্রমশই গভীর হয়ে অরণ্য-সঙ্কুল পাহাড়ে গিয়ে মিশেছে, এর উত্তর-দিকে টুকরো টুকরো কয়েক ফালি ধানের ক্ষেত; দক্ষিণের জঙ্গল ছোটখাট একটা মালভূমির ওপর দিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে আর একটা টিলার মাথায় উঠে এসেছে। ও-পারেই বাক্‌লার জঙ্গল, দুর্গাপুর থেকে দূরত্ব আড়াই-তিন মাইলের বেশী নয়।

বাক্‌লার জঙ্গল কিন্তু দুর্গাপুরের জঙ্গল অপেক্ষা অনেক বড়, এ জঙ্গলে আবার বাইসনের মত ভয়ংকর প্রাণীরও দেখা পাওয়া যায়, হাতীর পালও কখন-কখন এসে পড়ে। সম্বলপুর ও বিখ্যাত বামড়ার জঙ্গলের সঙ্গে এ জঙ্গলেরও যোগা-যোগ রয়েছে সিংহাসন পর্বতের মধ্য দিয়ে। দুর্গাপুর থেকে বাক্‌লার গ্রামে যেতে হলে একটা পাকদণ্ডি বেয়ে উঠতে হয়। বর্ষার জল ব'য়ে ব'য়ে সে পথ যেমন ভঙ্গুর—তেমনি এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো, বড় বড় পাথর ছড়ানো, সামান্য অসতর্ক হলেই হাত-পা ভাঙ্গার সম্ভাবনা। সে পথে যেমন মানুষ চলাচল করে, তেমনি

রাতের অন্ধকারে বুনো জন্তুরাও পারাপার হয়। এমন কি ভয়ংকর বাইসন্ পর্যন্ত নুন-মাটির লোভে গভীর রাত্রে এ-পথে পাড়ি জমায়।

সম্বলপুর-রোড থেকে বেরিয়ে আসা ধুলোর পথটা মস্ত একটা বাদাম গাছের গোড়ায় দু-ভাগে ভাগ হয়েছে। বাঁ-দিকের পথে গেলে বাক্‌লা, আর ডান-দিকের পথে দুর্গাপুর। বাদাম গাছটাকে চিনে রাখতে কোন কষ্ট হবে না, অসংখ্য কালো-কালো-বাদুড় হেঁট্-মুণ্ডে ঝুলে রয়েছে আপনার পথের ওপর চোখ রেখে। তাদের ডাক ও দুর্গন্ধই আপনাকে বুঝিয়ে দেবে যে, বাদাম-তলায় এসে পৌঁছেছেন, এরপর গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো সোজা—তবু সাবধান হওয়াই ভাল। কারণ পথের সেই সন্ধিস্থলে চিতার পায়ের ছাপ কয়েকবার আমার চোখে পড়েছে, কিন্তু পাকদণ্ডি পার হয়ে দুর্গাপুরে এসেছে এমন খবর আমার কানে আসেনি। চিতাটা তখন বাক্‌লা-বাসীদের কাছে রীতিমত একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, প্রায়ই গৃহপালিত জীবজন্তু মারা পড়ছিল। গৃহস্থরা যে সতর্ক নয় তা মোটেই বলা উচিৎ হবে না, বরং যথেষ্ট সাবধানী। তবু কোথায় যে ফাঁকের ফাঁক্ থেকে যায়, তা কেউ বুঝতে পারার আগেই যা ঘটবার ঘটে যায়। প্রাণীটা নিশাচর, তাই দিনের আলোয় কেউ দেখেনি সে কত বড় বা কত ভয়ংকর দেখতে। রাতের আঁধারেই তার যা কিছু কাজ কারবার। হল্লা উঠছে, টিন পেটানো হচ্ছে—তবু চিতাটার প্রাণে কোন ভয়-ডর নেই। দিনে-দিনে সে এমনি বে-পরোয়া হয়ে উঠেছিল।

সব জঙ্গলেই কিছু-না-কিছু চোরা-বন্দুকের সন্ধান মেলে, এ জঙ্গলও তার ব্যতিক্রম নয়, তবু চিতাটা মারা পড়ল না। নিরীহ হরিণের বংশ-নির্বংশ হলেও একটা ধূর্ত চিতা যে দুঃসাহসে ভর করে বস্তীতে হামলা করতে শিখেছে, তেমন প্রাণীর মোকাবিলা করা হয়তো সাধ্যে কুলোয়নি। সম্বলপুর ও আঙ্গুলের কিছু উৎসাহী শিকারী অবশ্য কয়েকবার চেষ্টা করে গেছেন।

আমার এ-কথা শুনে ভুলেও যেন ভাববেন না বাক্‌লা-বাসীরা ভীরু! কেউ কি পারবেন এমন একটা শ্বাপদ-সঙ্কুল বনে নড়বড়ে ঝোপড়ীতে রাত কাটাতে? সামান্য একটা ধাক্কায় যা ভেঙ্গে পড়তে এক-মিনিটও সময় নেবে না! রাতের গাঢ় অন্ধকারে যার আনাচে-কানাচে বন্য-প্রাণীরা অনবরত ঘুর-ঘুর করে বেড়ায়। বাঘের ডাক, ভালুকের চিৎকার আর বাইসনের ক্রুদ্ধ গাঁ-গাঁ ডাক শুনতে শুনতে স্বচ্ছন্দে হাত-পা ছড়িয়ে ওরা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে। সামান্য একখানি টাঙি সম্বল করে বনের দুর্গম পথে অবলীলাক্রমে পাড়ি দেয়, যা চিন্তা করলে সভ্য-

মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নেবে। এত দুঃসাহসী, তবু কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসে ওদের 'জুজুর-ভয়'—শিশুর মত অসহায় হয়ে পড়ে তখন।

যাই হোক, অনেক রাতের মত সে রাতটাও ব্যর্থ হয়েছিল, চিতাটার দেখা পাওয়া যায়নি। মাচা থেকে নেমে জ্যোৎস্না-প্লাবিত ঘাসের বন ঠেলে ঠেলে হলধরের সঙ্গে ফিরে আসছিলাম, সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কোথাও কিছু নেই, যতদূর দৃষ্টি যায় তন্ন-তন্ন করে লক্ষ্য করলাম কোন সচল প্রাণীই দৃষ্টিগোচর হল না, জ্যোৎস্নালোকে সব একাকার হয়ে গেছে। ঘন বনের মধ্যে ফিকে অন্ধকার, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ফালি-ফালি জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। এ-হেন সময়ে হঠাৎ হরিণ ডেকে উঠলো। হরিণটা ডাকলো আমার সামনের বন থেকে। তার সেই উত্তেজিত ডাক শুনে বুঝতে পারা গেল, তার দৃষ্টির পরিধির মধ্যে কোন মাংসাশী প্রাণী রয়েছে এবং সেই ভয়ংকর প্রাণীটা হয় কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর না-হয় যথেষ্ট দূরত্বে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

এখন হরিণটার আতঙ্কের কারণ যদি সেই চিতাটা হয় ভেবে তাড়াতাড়ি একটা মোটা শিমুল গাছের গুঁড়ির আড়াল নিলাম এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে ডাকটা থামিয়ে দিল। তখনও হরিণটাকে আমরা দেখতে পাইনি, হঠাৎ জঙ্গলের ভেতর থেকে ডালপালা ভাঙ্গার একটা শব্দ এল। তার পরেই দেখা গেল সে সোজা আমাদের দিকেই দৌড়ে আসছে। রাইফেল বাগিয়ে ধরলাম এই ভেবে যে, চিতাটাকে হয়তো তার পিছনেই ছুটে আসতে দেখবো। দেখতে দেখতে হরিণটা আমাদের পাশ দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালালো, কিন্তু চিতাটা তাড়া করে আসেনি। ধারণা করলাম চিতাটা হয়তো তাকে ধরবার সম্ভাব্য সুযোগ আগেই নষ্ট করে ফেলেছে এবং তখনও সামনের বনেই কোথাও ঘোরাফেরা করছে। পশ্চিমের যে জঙ্গল থেকে তখন আমরা ফিরে আসছিলাম চিতাটার ঘাঁটিও সেই বনে। অতএব আরও কিছুক্ষণ শিমুল গাছের গুঁড়ির আড়ালে অপেক্ষা করলে গুলি করবার একটা সুযোগ পেতে পারি। সেই আশায় প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করার পর উঠে দাঁড়ালাম, তার পর গুঁড়ি-মেরে অগ্রসর হওয়ার জন্য যেই পা বাড়ালাম অমনি আমার সামনে কি একটা পদার্থ সশব্দে আছড়ে পড়লো। চিতাটার সন্ধানে বনের দিকে এক-মনে তাকিয়ে ছিলাম, ভয়ানক চমকে মুখ তুলে দেখতে পেলাম শিমুল গাছের কোন একটা ডালে পাতার আড়ালে কি একটা কালো মত পাখী বসে রয়েছে এবং যে মুহূর্তে অগ্রসর

হওয়ার জন্য আমি পা বাড়ালাম অমনি তারও বিষ্ঠা-ত্যাগ করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

পাখীটা সামান্য নড়েচড়ে বসলো, আমি বাড়ানো পা-টা গুটিয়ে নিলাম, ভরা-পূর্ণিমায় চাঁদের আলো যেমন ঝরে পড়েছিল—তেমনি পড়তে লাগলো, শুধু শিমূল গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা কিছু পেছিয়ে গেল মাত্র। বনের কুসংস্কার নিয়ে কত কথা বলি, কিন্তু শিকারীদের কি কোন কুসংস্কার নেই! আমি অস্বীকার করি, আমার নেই—কিন্তু সামান্য বিষ্ঠার বাধাও অতিক্রম করতে পারি না। মনে ধন্দ জাগে, কেন বাধা পড়লো, নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে! হলধর আমার পিছনে ছিল, হঠাৎ ফিস্ ফিস্ করে কি বলে উঠলো ঠিক বুঝতে না পেরে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, সে চোখের ওপর হাত রেখে চাঁদকে আড়াল করে অত্যন্ত মনোযোগ-সহকারে কি দেখছে। হাতের আঙুল বাড়িয়ে ইসারা করতেই তাড়াতাড়ি লক্ষ্য করলাম বনের অন্ধকার ছায়ায় কি যেন একটা দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরেই সেই ছায়া-মূর্তি নড়াচড়া শুরু করলো, তারপর স্পষ্ট বুঝতে পারলাম বন থেকে সে বেরিয়ে আসছে।

বড় বড় ঘাসের মধ্য দিয়ে সে আসছিল, ফলে শরীরের অর্ধেকটা ডুবে ছিল ঘাসের মধ্যে। শুধু মাথা ও পিঠের উপরের অংশটুকু চোখে পড়ছিল, সে আসছিল অত্যন্ত ধীর-চালে আমাদের মুখোমুখী। রাইফেলটার সেফ্টি-ক্যাচ্ খুলে বাগিয়ে ধরলাম। শিমূল গাছটার গোড়ায় ফোঁড়ার মত খানিকটা ঠেলে বেরিয়েছিল, তার ওপর রাইফেলের নল্ রেখে একটা নিখুঁত নিশানা নিতে কোন অসুবিধা ছিল না। আমি যখন তৈরী হয়ে তার অপেক্ষা করছিলাম, তখন সে চাঁদের আলোয় ধীরে ধীরে ঘাস-বনটা পেরিয়ে আসছিল। চাঁদের আলোয় দূর থেকে কোন জন্তুর রং এবং আকৃতি সঠিক বোঝা যায় না, তাকে তখন সাদা মতন দেখাচ্ছিল।

দূরত্ব যখন আর মাত্র তিরিশ গজ, ঘাস-বন যথেষ্ট হাল্কা হয়ে এসেছে—তখন সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। এতক্ষণ সে আসছিল মুখোমুখী, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াতেই গুলি করবার সবথেকে ভাল সুযোগ এসে গেল। রাইফেলটা তুলে ধরলাম, ভাল-ভাবে নিশানা নিতে গিয়েই আমাকে থমকে যেতে হল। প্রথমেই চোখে পড়ল তার মোটা রোমশ ল্যাজ, তারপর প্রকাণ্ড দেহের অন্যান্য চিহ্নগুলো। অত্যন্ত হতাশ হয়ে দেখলাম জন্তুটা চিতা নয়, অতিকায় একটা নেকড়ে। যেদিকে মাথা ঘুরিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই দিকেই চলে গেল। অবশ্যই নিরাশ হতে হল, তবু যে

যতই গাল পাড়ুক—শিকারী হিসেবে স্বীকার করতে দ্বিধা করবো না, নেকড়েটা শিকার করবার উপযুক্ত। এতবড় নেকড়ে এর আগে আর কখন দেখিনি। তবু চিতার আশায় রাইফেলের শব্দ করতে পারলাম না, বাক্‌লা-বাসীদের কথা দিয়েছিলাম আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি থাকবে না।

যথেষ্ট উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠায় প্রায় এক ঘণ্টার ওপর মুখ বন্ধ রেখে, চোখ-কান খুলে যে সময়টা কাটান হল, দেখবার জন্য তখন সেখানে কেউ ছিল না। হয়রানি আর ব্যর্থতা আমার নিত্য-সঙ্গী হয়ে পড়েছিল, সে রাত্রে ঘাস-বনের মধ্যে এত সহজে চিতার দেখা পাবো এবং গুলি করবার সুযোগও এসে পড়বে কল্পনাও করিনি। অদৃষ্টের ওপর কারো হাত নেই, তবু মাঝে মাঝে অদৃষ্ট যখন এমন অকৃপণ হয়ে পড়ে, তখন আমিত্বের গুরুত্ব যেন হঠাৎ বেড়ে যায়। মনে হয় সেই পলাতককে যেন ধরে ফেলেছি,—"মোর মুষ্ঠি ছাড়াবি কি করে—"। শেষে ফাঁকিটুকু যখন ধরা পড়ে তখন শূন্য মুষ্ঠি খুলে শূন্য দৃষ্টি মেলে বোকার মত শুধু একটু হেসে ফেলা। গুলি করতে গিয়ে যখনই দেখলাম জন্তুটা চিতা নয়, তখন আমার মুখের চেহারা কেমন হয়ে পড়েছিল দেখবার জন্য যদিও কেউ তখন সেখানে ছিল না, শুধু বোকার মত হেসে ফেলা-টুকু হলধরের চোখে ধরা পড়ল। সে তখন ঢোঁক্ গিলে গিলে গলায় জড়িয়ে যাওয়া শ্লেষ্মা নামাবার চেষ্টা করছিল, শেষে শব্দ করে কেশে গলা সাফ্ করে বললো, গু'টে সিগারেট দিও। চিতাটাকে গুলি করার কোন সম্ভাবনা রইল না এবং অন্য কোন জন্তুও যখন শিকার করবো না, তখন সিগারেট খেতে আর আপত্তি কি! তখন যত তাড়াতাড়ি বাংলোয় ফিরে একটু বিশ্রাম নিতে পারি সেই ধান্দা।

খোলা জমিটা পার হয়ে সামনের ঘন বনের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। এতক্ষণ খোলা আকাশের নীচে ছিলাম, গাছের ছায়ায় আলো কমে গেল। তবু সেই আলো-আঁধারে কি অপরূপ জ্যোতি ফুটে উঠেছিল! চতুর্দিকে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টির ধারার মত জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছিল। সে এক বর্ণনাতীত দৃশ্য! বল্লমের ফলার মত অজস্র অসংখ্য সাদা সাদা রেখা তির্যক ভঙ্গিমায় বনের সর্বত্র যেন গিঁথে রয়েছে। মৃদু-মন্দ বাতাসে ধোঁয়ার মত সাদা-সাদা সেই রেখার মধ্যে যেন এক আশ্চর্য তরঙ্গ-স্রোত ওঠানামা করছিল, মধ্যে মধ্যে গাছের গুঁড়ির দীর্ঘ লম্বা কালো-কালো ছায়া। ঘাস-পাতা, কাঠি-কুটি সব স্যাঁৎ-স্যাঁতে—পায়ের চাপে কোথাও কোন শব্দ নেই। ঝিঁঝিঁ পোকারাও ডাক থামিয়েছে, পশু-পক্ষীরাও নীরব, কানের মধ্যে এক-নাগাড়ে বেজে চলেছে শব্দহীন সেই

অনুভূতি, ঝিম্‌-ঝিম্‌-ঝিম্‌-ঝিম্‌······কেউ-কেউ বলেন—রাবণের চিতা জ্বলছে। নিঃশব্দে হাঁটছিলাম, অনেকটা পথ এসেও গেছি।

হঠাৎ সামনের পথে কালো মতন কি একটা নড়ে উঠলো, মস্ত একটা কালো পাথরের স্তূপের মত। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম, দীর্ঘ এক মিনিট ধরে স্তূপটাকে লক্ষ্য করতে করতে মনে পড়ল, আসার সময় স্তূপটাকে ওখানে দেখিনি তো! এমন সময় কালো পাথরটা আবার যেন নড়ে উঠলো! চুপি-চুপি হলধরকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওটা কি? হলধর এতক্ষণ খেয়াল করেনি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে করতে হঠাৎ আমার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরলো। আমি হকচকিয়ে গেলেও বুঝতে পারলাম শক্ত হাতটা কাঁপছে। কালো পাথরের মত স্তূপটা একশো গজও দূরে নয়! দারুণ উত্তেজনায় হলধর চোখ বড় বড় করে আমার কানে থুথুর দুর্গন্ধ ছিটিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলো, গইলা! অর্থাৎ গোয়েল, ইংরাজীতে যাকে বলা হয়—'বাইসন্'। ভয়ঙ্কর-ভয়াল দর্শন বাইসন্ সারারাত চরা করে তখন সেখানে পাশ ফিরে শুয়ে বিশ্রাম করছিল, জাবর কাটছিল। সৌভাগ্য—আমাদের দেখতে পায়নি, আমাদের দিকে পিছন ফিরে শুয়েছিল সে।

বাইসন্ সাধারণত দলবদ্ধ হয়ে বিচরণ করে, কিন্তু দলত্যাগী বা বিতাড়িত 'একা-বাইসন্' (Single Bison) অত্যন্ত বদ্-মেজাজী। অহেতুক আক্রমণ করে বসে এবং সে আক্রমণ অত্যন্ত মারাত্মক। এ-ধরনের বাইসন্ দলত্যাগের বা বিতাড়িতের জ্বালায় সব সময় ক্রোধে উত্তপ্ত হয়ে থাকে। যা কিছু দেখে সবই তখন শত্রু, প্রচণ্ড বিদ্বেষে বা আক্রোশে পিষে মারতে চায়—এদের দেশী কথায় বলে 'এক্-ঠিয়া'। এক্-ঠিয়া বাইসন্ শিকারের এক তীব্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল উড়িষ্যার কোরাপুট জেলায়, তারপর নর্দার্ন-রেঞ্জে।* মাত্র একশো গজ দূরে সেই এক্-ঠিয়া বাইসন্ রাতের শেষ-প্রহরে শুয়ে বিশ্রাম করছিল। ঊষার আলো ফুটে ওঠার পূর্বেই গভীর পাহাড়ী-অঞ্চলে অন্তর্ধান করবে। বিশাল আকার বাইসন্ যেমন ক্ষিপ্র তেমনি তেজী, মুহূর্তের অবসরে সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ-সতর্ক হয়ে ওঠে, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হুঁসিয়ার প্রাণী!

বজ্র-মুষ্টিতে হলধর আমার হাত চেপে ধরেছিল। আমার রাইফেলে তখন 'সফট্-নোজ' গুলি-ভরা, যা দিয়ে বাইসনের মত বিশাল দৃঢ়-মাংশপেশী সম্পন্ন প্রাণী মারতে যাওয়া নিছক হটকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়, তার জন্য প্রয়োজন

---

* 'শিকারের বিচিত্র কাহিনী' দ্রষ্টব্য।

আরও শক্তিশালী 'হার্ড-নোজ' গুলির। দ্বিতীয়ত বাইসন্ শিকারের কোন পারমিটও সংগ্রহ করিনি। আমি যখন এইসব ভাবছিলাম তখন হলধর বার-বার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছে, হয়তো মনে করেছিল 'গইলা' দেখে আমি ভয়ে জমে গেছি। হঠাৎ হলুদে ছোপ্-ধরা দাঁত খিঁচিয়ে চাপা-স্বরে যা বলে উঠেছিল, তা উদ্ধার করলে অনেকটা এই রকম দাঁড়াবে—আস, গইলা ভুঁড়ি ফাঁসি-কিরি জানে মারি দিবে। এই বলে—আমার হাত ধরে হিড়-হিড় করে টানতে-টানতে কোথায় যে নিয়ে চললো, কিছুই বুঝতে পারলাম না। পাছে বাইসন্টা টের পায়, সেই ভয়ে কিছুই বলতে না পেরে নীরবে কাঁটা-ঝোপ, খানা-গর্ত পার হয়ে ছুটতে লাগলাম। কতক্ষণ সেইভাবে চলার পর বললাম—হাত ছাড়, আর ভয় নেই। এখানে বাইসন্ ভুঁড়ি ফাঁসাতে আসবে না। হাত ছেড়ে, হাঁফ্ ছেড়ে হলধর এতক্ষণ পরে কথা বললো, গু'টে সিগারেট দিও। ভঙ্গিমা তখন বীরের মত, ভূমিকা ত্রাতার মত—ছোপ্-ধরা দাঁতে চাঁদের আলো অসঙ্কোচে ঝিলিক্ দিয়ে গেল।

সিগারেট ধরান হল। মৌজ করে টানও দেওয়া হল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞাসা করলাম—বন-বাদাড় ভেঙ্গে টেনে-হিঁচ্ড়ে তো আনলি, এখন পথ চিনে ঠিক যেতে পারবি তো, বাট ঠিক আছে তো? 'অছি অছি'—বলে সিগারেটে বড় বড় টান্ দিতে দিতে হলধর পথের নিশানা খুঁজতে লাগলো। আমি জানতাম এ-ভাবেই ওরা হারানো পথের হদিস করে। কতবার দেখেছি গাছের একটা মোচড়ানো ডাল, নয়তো মাথা-ভাঙ্গা কোন ঝোপ অথবা ঘাসের বুকে খোব্লানো একটু মাটি পরীক্ষা করেই পথ নির্ণয় করেছে। সিগারেটটা তখনও শেষ হয়নি, 'এ-পাকে আস'—বলে একদিকে হঠাৎ চলতে শুরু করলো। অনেকটা যাওয়ার পর আবার জিজ্ঞাসা করলাম, হলধর বাট ঠিক আছে তো? সেবার আর পূর্বের মত 'অছি-অছি' বলল না, থমকে একবার দাঁড়িয়ে আবার চলতে আরম্ভ করলো। জঙ্গলের এ-দিকটায় এর আগে আর কখন আসিনি, সুতরাং কিছুই চিনতে পারছিলাম না। আমার কাছে তখন সব বাট-ই ঠিক বাট। সেই ঠিক বাটের তল্লাসে তখন কাঁটা, ঝোপ, খানা-খন্দ সব মাড়িয়ে-ডিঙ্গিয়ে অন্ধের মত অনুসরণ করে চলেছি।

হঠাৎ সে থেমে পড়তেই রাইফেল বাগিয়ে পাশে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হল? কোন জবাব দিল না হলধর, মাথা ঝাঁকিয়ে বন দেখতে লাগলো। তারপর হঠাৎ বলে উঠলো—সেই গাছটা গেল কোথায়, পাথরের সেই চাতালটা!

হলধরের মুখে-চোখে কেমন একটা করুণ নৈরাশ্য ফুটে উঠেছিল, একটা গাছের গায়ে হাত রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। তারপর চোখের চামড়া কুঁচকে কি চিন্তা করলো। ডান-হাতটা আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিল পুরো আধ-মিনিট, তারপর শূন্যে আঙ্গুল বাড়িয়ে হিজিবিজি কাটতে-কাটতে হঠাৎ জ্যামিতির দ্বি-ভুজের মত একটা কোণ আঁকলো। আমি অবাক হয়ে তার কীর্তি দেখছিলাম, আর ভাবছিলাম গড়বড় কিছু একটা হয়েছে।

লক্ষ্য করলাম, যে গাছটার গায়ে হাত রেখে জ্যামিতির কোণ এঁকেছে, সেই কোণের পেট-চিরে সোজা লাইন টানলে যেখানে পৌছবে, সেখানেই বাইসন্ শুয়ে ছিল। আর সেই কোণের নিম্ন-বাহু সেই জায়গায় পৌছিয়েছে—যে পথ ধরে আমরা পালিয়ে এসেছি। কোণের উর্ধ্ব-বাহু বাইসনের অবস্থান উজিয়ে আরও এক-শো দেড়-শো গজ ওপরে গিয়ে পৌছবে। এইভাবে হলধর পুরনো-পথে ফিরে যাবার ছক আঁকলো। তার জ্যামিতির জ্ঞান দেখে আশ্চর্য হলাম, বলবার কিছুই ছিল না—আমি তখন অথৈ জলে, কোন কূল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হলধর চলতে গিয়ে ফিরে দাঁড়ালো, তারপর বললো—আস, বাবু। সেই কোণের উর্ধ্ব-বাহু ধরে আমরা হাঁটতে লাগলাম, কোথায় যে চলেছি কিছুই জানি না, শুধু লক্ষ্য করলাম, সে বিশেষ গম্ভীর হয়ে গেছে।

কত পথ হাঁটলাম, তবু পুরনো বাট এল না, চেনা-পরিচিত গাছ-পালা, নালা কিছুই নজরে এল না। তবু হাঁটার বিরাম নেই। কাঁটা-ঝোপে হাত-পায়ের চামড়া ছিঁড়ে যেতে লাগলো, পায়ের তলা জ্বালা করতে লাগলো, পায়ের বুড়ো-আঙ্গুল বিষ-ফোঁড়ার মত ব্যথায় টাটিয়ে উঠলো—তবু পুরনো বাট খুঁজে পেলাম না। কখন এক পাহাড়, কখন ছোট-খাট টিলা, আবার কখন জলার কাদায় হুড়মুড় করে নেমে পড়েছি। চতুর্দিকেই শুধু বন, ঝোপ-ঝাড়-পাথরের মস্ত-মস্ত ঢিবি, নালা-খানা-খন্দ যেন হাঁ করে রয়েছে। চাঁদের আলোয় একই আদল্, একই রকম-চেহারা সর্বত্র। বর্শার তীক্ষ্ণ ফলকের মত জ্যোৎস্নার-ধারা পাতার ঘুলঘুলি ফুঁড়ে বনের সর্বত্র গিঁথে রয়েছে। ধোঁয়ার মত সাদা-সাদা সেই রেখায় চোখে ধাঁধাঁ লাগে, মনে হয় আলোর সেই লাইন ধরে কি যেন নেমে আসছে—আবার ভাসতে ভাসতে মিলিয়ে যাচ্ছে শূন্যে। সে আসা-যাওয়ার কোন বিরাম নেই, যতি নেই, অবশ-বিবশ হয়ে শুধু চেয়ে থাকতে হয়। চোখের পলক ফেললেই কি যেন হারিয়ে যাবে, কি যেন আর দেখা হবে না। নীরব-নিস্তব্ধ চাঁদনী-রাত, শুধু অক্লান্ত-স্বরে ঝিঁঝিঁ ডেকে চলেছে, ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ……।

চলতে-চলতে হঠাৎ বসে পড়ল হলধর, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে দু-হাতে ঘাস-পাতা সরিয়ে মাটিতে কি খুঁজতে লাগলো। পরক্ষণেই ছুটে গিয়ে কোন গাছের গায়ে হাত বুলিয়ে টাঙ্গির আঘাতের চিহ্ন খুঁজলো পাঁতি-পাতি করে, কখন পাথরের ঢিবির ওপর উঠে দূরের বন-জঙ্গলের দিকে পাগলের মত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলো। পথ! পথ খুঁজে-খুঁজে তখন সে পাগল হয়ে উঠেছে। দিশেহারার মত শুধু হাতড়াতে লাগলো চতুর্দিক, আর বিড় বিড় করে আওড়াতে লাগলো—'এ-পাকে, এ-পাকে'।

তার অবস্থা ক্রমে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো দেখে ভয় পেলাম, আমারও উৎকণ্ঠার কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। তবু বললাম—হলধর চুপ করে এক-জায়গায় দাঁড়া, মন স্থির কর,—বাট ঠিক মিলে যাবে। কিন্তু আমার কথা সে বিশ্বাস করতে পারলো না, স্থির হওয়া তখন তার পক্ষে অসম্ভব। বাট-বাট করে সব মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। হঠাৎ আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'এ-পাকে'। তার ভাব-ভঙ্গি ক্রমশই ভীতিজনক হয়ে উঠলো, আমি আর দ্বিরুক্তি না করে নীরবে অনুসরণ করতে লাগলাম। হলধর অগ্রসর হতে থাকলো, কখন থমকে দাঁড়ালো, আবার পিছিয়ে এসে কি দেখলো, তারপর পুনরায় লম্বা পা বাড়িয়ে দিল—যেন দু'পা গেলেই সব সমস্যা মিটে যাবে।

ক্রমে ক্লান্ত, অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লাম। ভয়ে বিবর্ণ-হয়ে উঠলো হলধর, কথা বলতে পারছিল না—দু-পাশের কষে ফেনা জমে উঠেছিল। কোন জ্ঞান ছিল না, কোথায় চলেছি—কেন চলছি সব হুঁশ তখন বেহুঁশ হয়ে গেছে। এত আলো, তবু চোখে কেবলই ধাঁধাঁ লাগছিল। কি দেখছি আর কি দেখছি না, সে বোধশক্তি তখন লোপ পেয়ে গেছে। এ অবস্থায় হাঁটতে-হাঁটতে আমি ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছিলাম, আমাকে ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে গেছে হলধর। অন্ধকারে তাকে ভূতের মত দেখাচ্ছিল, কালো দীর্ঘ শীর্ণ চেহারায় তাকে সেই রকমই মনে হচ্ছিল।

হঠাৎ সমস্ত বন কাঁপিয়ে তীক্ষ্ণ ভয়ার্ত গলায় কে চিৎকার করে উঠলো, পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গেলাম। ঠিক মানুষের কণ্ঠে কে যেন বুক-ফাটা আর্তনাদ করে উঠলো, আঁ-আঁ-আঁ……আমার আর চলৎ-শক্তি রইল না। প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলাম,—হ-ল-ধ-র,—কোন সাড়া পাওয়া গেল না। হলধরকে কোথাও দেখতে না পেয়ে বা তার সাড়া না পেয়ে কয়েকটা মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে রইলাম। তারপর হলধরকে বনের যে প্রান্তে শেষবারের মত দেখতে

পেয়েছিলাম, সেই-দিক লক্ষ্য করে প্রাণপণে দৌড়তে শুরু করলাম। যে কোন বন্য-জন্তুর সামনে পড়ে যেতে পারি বা ঝোপের পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকা কোন ময়ালের ঘাড়ে পা তুলে দিতে পারি—সে-সব কিছুই তখন মনে ছিল না। দৌড়তে-দৌড়তে একটা ঝোপের পাশে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সেই আলো-আঁধারিতে দৈবাৎ চোখে পড়ল পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে হলধর। ভয়ে-ভয়ে এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখতেই ভীষণ চমকে উঠলো, তারপর আমাকে দেখে কি বলবার জন্য মুখ হাঁ-করে রইল, কিন্তু কোন শব্দ তার হাঁ-করা মুখ থেকে নির্গত হল না। ভয়ে তখন চোখ কোটর ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে, কে চিৎকার করে উঠলো? কোন উত্তর নেই, শুধু ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল। দুর্বোধ্য, শূন্য সে দৃষ্টি—আতঙ্কে দিশেহারা।

বোতল খুলে তাড়াতাড়ি মুখে জলের ঝাপ্টা দিলাম, জল খাওয়ালাম, শেষে একটা কড়া চারমিনার দিয়ে বললাম—জোরে জোরে টান। কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হল সে, আচ্ছন্ন-ভাব কেটে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, ভয় পেয়েছিলি? জবাবে বললো—ভূত, কালা-মতন! ভালুক হবে ভেবে চারদিক খোঁজ করে দেখলাম, কিন্তু কিছুই নজরে এল না—শুকনো পাতা মাড়িয়ে যাওয়ার কোন শব্দও হল না। হলধর বোকার মত ঘাড় নেড়ে সিগারেটে ঘন-ঘন টান দিতে লাগলো, বুকের মধ্যে হাতুড়ি-পেটা ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে আসছিল।

বিপদ যখন আসে, পর-পরই আসে। একটা ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই আর এক বিপদ এসে হাজির হল। তখন নিজেকে সামলে নিয়েছে হলধর, পথের কথা আবার ভাবতে আরম্ভ করেছে। হঠাৎ সেই নীরব নিস্পন্দ রহস্যময়ী রাত্রির বুক-চিরে তীব্র ব্যঙ্গের মত দুর্বোধ্য এক উৎকট হাসি ভেসে এল। সেই হা-হা-হা-হা রব শুনে যেন পাণ্ডুর হয়ে উঠলো রূপসী রাত্রি। ভুবন-ভোলানো সেই রহস্যময়ী আবরণ তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে মুহূর্তে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করে সেই ভয়ানক অট্টহাস্য দূরে—বনের অন্তরালে কোথায় মিলিয়ে গেল! ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো হলধর। বললাম—ভয় নেই, হায়না ডাকছে। কিন্তু আমার কথা তার কানে পৌছল না, মাতালের মত টলতে-টলতে বনের মধ্যে ছুটে কোথায় চলে গেল। আমার পায়ে আঘাত লেগেছিল, দৌড়তে পারছিলাম না, কোনরকমে ধরে ফেললাম। বললাম—ভয় পাচ্ছিস কেন? আমার হাতে তো রাইফেল রয়েছে, কেউ কিছু করতে পারবে না। ধরা পড়ে হলধর মরা-মানুষের মত শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো কতক্ষণ, তারপর ধীরে ধীরে আমার কাঁধে মাথা রেখে

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। আমার দেওয়া কোন সান্ত্বনাই তাকে স্পর্শ করতে পারলো না। তেমনি কাঁদতে-কাঁদতে হঠাৎ সামনের বনের গভীর জ্যোৎস্নার দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বলে উঠলো—মোহিনী! মুই মরি যিবা—বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

সেই জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনীর অপূর্ব মায়ালোকে তন্দ্রাহারা নিশীথিনি অভিসার-সাজে যখন চঞ্চলা, উন্মনা চৈতি-বাতাস গোপনে ফুলের কুঁড়ির ঘুম ভাঙ্গিয়ে আনমনে পরাগে বসন্তের দোলা দিয়ে গেল। এ-হেন মধুর মুহূর্তে হলধর কি দেখলো জানি না, আতঙ্কে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো—মোহিনী! অবাক হয়ে গেলাম,—মনে হল কায়াহীন কোন মায়াময় অনুভূতি চেতনা-লুপ্ত শিরায়-শিরায় উদ্দাম নৃত্য করে চলেছে।

ভরা-পূর্ণিমার শুভ্র জ্যোৎস্না নিয়ে অরণ্য সে-রাতে মোহিনী-মায়ায় উদ্বেল হয়েছিল, চৈতি-বাতাসে ওড়না উড়িয়ে, কাশের-বনে নৃত্য করে ঝর্ণার স্বচ্ছ জলে নূপুর বাজিয়েছিল। জঙ্গলের কিম্বদন্তী—মোহিনী সব ভুলিয়ে দেয়, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হয়রান করে, শেষে মেরে ফেলে। মোহিনীর হাতছানি থেকে কেউ ফিরে আসতে পারে না। হলধরের দেখা সেই সুন্দরী মোহিনী পথ ভুলিয়েছে, হয়রান করেছে—একে শরীর অবসন্ন! দু-চোখে বিভীষিকা। তার কান্না, তার ভয়, কখন যে আমার মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল বুঝতে পারিনি।

আলোর ধোঁয়াশায় সব একাকার হয়ে গেল। কোথাও ছায়া, কোথাও ছায়া-ঘন অস্পষ্ট অন্ধকার। সেই আলো-আঁধারির কুহেলীতে বিবশ চোখের-তারায় খেলে গেল কত ছায়ার-ফাঁকি! কত কায়াহীন ছায়া-মূর্তি, কত অবয়ব বিচিত্র ভঙ্গিমায় আলোর স্রোতে নেচে গেল। কেউ পরস্পরকে আলিঙ্গন করলো, কেউ আপন-মনে দোল খেতে লাগলো, কেউ শুধু মাথা নেড়ে হাঁ-না কিছুই জানালো না। আবার পাতার ঘুলঘুলির ফাঁকে কেউ ইসারায় ডেকে গেল, কোথাও বোবা-ইসারায় স্তব্ধ উপবন। চোখের তারা বেয়ে কারা এমনি মুহূর্তে-মুহূর্তে সরে যেতে লাগলো, অথচ কোথায় যে যায় তারও হদিস মেলে না। বনের সহস্র চোখ, সহস্র কান—আমি যাব কোথায়! গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগলো। তবু মনের অবচেতনে ছিল এক আশ্চর্য বাস্তব উপলব্ধি। আমারই যদি এ-অবস্থা হয়, তাহলে নিরক্ষর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ভূত-প্রেতে বিশ্বাসী হলধরের মনে কি সাংঘাতিক বিপর্যয়ই না ঘটেছিল। মোহিনী লৌকিক কিছু নয়, হয়তো কায়াহীন-ছায়াহীন মায়াময় কোন কাল্পনিক

অশরীরি অনুভূতি, যা এমন রাতে বিভ্রান্ত মনে অনর্থক প্রমাদ ঘটায়, স্নায়ুযন্ত্র সে প্রভাব সহ্য করতে না পেরে সাময়িক বিকল হয়ে যায়।

হলধরকে বললাম—বাট যখন মনে পড়ছে না, আয়—একটা গাছতলায় বসি, সকাল হলেই বাট ঠিক খুঁজে পাব। আমার কথা শুনে আঁৎকে উঠলো হলধর। বললো, না—না, খবরদার এ-কাজ করবে না বাবু! একবার বসলেই মোহিনী ঘুম পাড়িয়ে দেবে, তখন বাঘ-হুড়ার এসে খেয়ে ফেলবে। হলধর বসতে দিল না, লোকটা মোহিনী-আতঙ্কে এবার সত্যিই মারা পড়বে।

এমন সময় একটা শিয়াল চুপি-চুপি বন থেকে বেরিয়ে ইতিউতি তাকালো, তারপর তুল্‌কি-চালে চলে গেল। শিয়ালটাকে দেখেই চমকে উঠলাম, কেন যে তার পিছু-পিছু যাবার ইচ্ছে হয়েছিল তা জানি না। দ্রুত শিয়ালটাকে অনুসরণ করে জলাভূমি পার হয়ে উঁচু-বনে এসে পৌঁছতেই শিয়ালটাকে আর দেখতে পেলাম না। চোখের সামনেই যেন উধাও হয়ে গেল।

লক্ষ্য করলাম, বন অনেক ফাঁকা হয়ে গেছে। হলধর বাট খুঁজে পেল, হেসে বললো—বাট কাঁই যিবা! এতক্ষণে বেচারীর মুখে হাসি ফুটে উঠলো, কিন্তু সে হাসি যে এমন ক্ষণস্থায়ী সে-কথা কারো জানা ছিল না। অমনি ডান-দিকের বন থেকে হঠাৎ এক ভূতুড়ে বাঁশী বেজে উঠলো, একেবারে হতবাক হয়ে গেলাম! এমন ভয়ঙ্কর রাতে গভীর বনে বসে কে বাঁশী বাজাতে পারে ভেবে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। হলধরের দিকে তাকালাম, সে কানে আঙুল দিয়ে ভয়ে সিঁটিয়ে মুখ নীচু করে রয়েছে। বললো—মোহিনী ডাকছে! সেই ভূতুড়ে সুর না-শোনার ভান করে বলতে লাগলো—এ বাঁশী শুনতে নেই, শুনলে পাগল হয়ে যায়। বললাম, খুব মিষ্টি সুর। ঘাড় নেড়ে সায় জানালো, তারপর মুখ তুলে নেশাগ্রস্তের মত সুর করে বললো—হুঁ, মহুয়ার মত মিষ্টি—নেশা লাগে! এ নেশা লাগলে আর বাঁচতে হবে না, জানে মারি দিবে। বলে—আমাকে বিন্দুমাত্র আভাস না দিয়ে হুড়মুড় করে বাঁ-দিকের ঢালু বেয়ে নেমে গেল। আমিও সঙ্গে-সঙ্গে তার পিছু নিলাম ও কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝতে পারলাম—সেই পাকদণ্ডি দিয়ে নামছি, দুর্গাপুর ডাকবাংলো থেকে বাকুলার বনে আসতে হলে যে পাকদণ্ডি পড়ে। সেই এবড়ো-খেবড়ো পাথরে-ভরা ভঙ্গুর পথ। পাকদণ্ডির নীচে ছোট্ট সেই বন, তার ওপরেই দুর্গাপুরের ধানক্ষেত—ক্ষেতের শেষ মাথায় গ্রাম। আমার বাংলো একটা টিলার মাথায়, গাছের আড়াল পড়ায় এখান থেকে দেখা যাবে না।

পাকদণ্ডির শেষে ছোট্ট বনটায় প্রবেশ করলাম। অনেক স্বস্তি অনেক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এমন সময় শুকনো কাঠি ভাঙ্গার হাল্কা শব্দ কানে আসামাত্র আবার সজাগ হয়ে উঠলাম। থমকে দাঁড়াতে হল, কিন্তু দ্বিতীয়বার আর শব্দ হল না। তখন বাধ্য হয়ে গুঁড়ি-মেরে অগ্রসর হতে হতে হঠাৎ একটা দো-ডালার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম একটা হরিণ চলে যাচ্ছে। চিতাটাকে আমি এ-বনে আশা করিনি, সাবধান হয়েছিলাম অন্য কারণে—বাইসনের টাটকা নাদি চোখে পড়েছিল। হরিণটা তখন চাঁদের আলোয় ধানক্ষেত মাড়িয়ে দুর্গাপুরের বনে চলে যাচ্ছিল। উত্তেজিত-স্বরে হলধর বলে উঠলো, মারো। হরিণ দেখে সে তখন অন্য-মানুষ, এমন কি মোহিনীর ভয় পর্যন্ত চলে গেছে। আমাকে পিছন থেকে আঙ্গুলের খোঁচা মেরে তাগাদা দিতে লাগলো, মার-মার, চালি যাচ্ছে। হলধরের লোলুপ দৃষ্টির ওপর দিয়ে বনের অপ্সরী তখন জ্যোৎস্না মাড়িয়ে মাড়িয়ে ওপারের বনে মিলিয়ে যাচ্ছিল। জিভের একটা আফ্‌শোষের শব্দ করে বললো···—বড় শিঙেল!

শিকারী মাত্রই কি ঘাতক! কি জানি, হয়তো রক্তের একটা নেশা আছে! হরিণটা চলে যাবার পর কেন এমন চাঞ্চল্য অনুভব করলাম, কেন পিছন ফিরে হলধরকে সমর্থন করলাম—হ্যাঁ, বড় শিঙেল! চাল্লিশ-বিয়াল্লিশ-ইঞ্চি শিং সচরাচর দেখা যায় না।

তখন চাঁদ ঝরে যাচ্ছিল, বনের অপ্সরীরা জ্যোৎস্না মাড়িয়ে মাড়িয়ে ঘরে ফিরছিল, মোহিনী বাঁশীতে ফুঁ দিয়েছে, পাখীরা ভোরের স্বপ্ন দেখছিল। আলোর ঝরণায় নীরব নিস্পন্দ অরণ্য-পাহাড়, এ হেন দুর্লভ মুহূর্তে অযথা রাইফেলের আওয়াজ কি করতে পারি! রাইফেলের শব্দকেও যে ভালবাসি, ওর গুরু-গম্ভীর আওয়াজে বজ্রের সুর শুনি—শব্দের গভীরে কে যেন 'সংহার ও সৃষ্টির' ডম্বরু বাজায়! আমি রাইফেল ছুঁড়তে শিখেছি সেই ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে। শব্দ ও নৈঃশব্দের আনন্দ ও বেদনায় সমান ভারাক্রান্ত। ভেবে পাই না—প্রকৃতির উদার-অনন্ত হৃদয়ে কোন অনুভূতি নেই, দুঃখও নেই······! ফুল ঝরে—বনের হাসি মুছে যায়, পাখী মরে—গান থেমে যায়—এ অনুভূতি কি অর্থহীন, নৈরাশ্যবাদীর হাহাকার মাত্র। এক যায়—আর এক ফিরে আসে! নব-অঙ্কুরে, শাখা-নীড়ে বারে বারে ফিরে আসে হাসি-গান—ঋতুমতি প্রকৃতি যে সর্বংসহা!

হলধর বর্ণিত সেই মোহিনীর সম্মোহিনী-জাল ছিন্ন করে সে-রাত্রে কোন-রকমে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছিলাম। মোহিনী-মায়ার অবশ্যই আচ্ছন্ন

হয়েছিলাম, অবশ-বিবশ হয়েছিল অবসন্ন স্নায়ুযন্ত্রগুলো। সেই সর্বগ্রাসী রূপ সহ্য করবার হয়তো সাধ্য ছিল না, উন্মত্তের মত প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। এই রোদ-ছড়ানো সকালে বসে মনে হয়—স্বপ্ন! সর্বাঙ্গে স্বপ্নের সেই ব্যথা, পায়ের ক্ষতবিক্ষত আঙুল বিষ-ফোঁড়ার মত আড়ষ্ট। শ্রীচরণের খাতিরে পরদিন কোথাও যাওয়া সম্ভব ছিল না, সুতরাং বাংলোর-বারান্দা সেদিন জমে উঠেছিল জঙ্গলের বিচিত্র কাহিনীতে।

চূড়ামণি গত-রাত্রেই ফিরেছে। সে গিয়েছিল সম্বলপুরের হাটে বলদ কিনতে। অনেকদিন থেকেই যাব-যাব করছিল, হঠাৎ বাক্‌লার দুজন সঙ্গী জুটে গেল। চূড়ামণির হালের দুটো বলদের একটা বড়, অপরটা ছোট। ফলে লাঙ্গল দেওয়ার সময় একদিক যেমন উঠে পড়ে, অপর-দিক তেমনি নেমে যায়। দুটো বলদের ওপর সমান ভার না পড়ার দরুন লাঙ্গলের ফলা ঠিক-মত মাটিতে গেঁথে যায় না, জমিও ঠিক-মত তৈরী হয় না। এই অসুবিধায় সে ভুগছিল অনেকদিন, হঠাৎ বাক্‌লার সঙ্গী জুটে গেল। কিন্তু মনের মত ভাল বলদ না পেয়ে ফিরে এসেছিল এবং আমি হলধরের সঙ্গে চিতাটার সন্ধানে পশ্চিমের বনে গেছি শুনে পর্যন্ত তার স্বস্তি ছিল না। সুতরাং সকাল-বেলায় ছুটে এসেছিল বনের খবর শোনবার জন্য। গ্রামের আরও কয়েকজন উৎসাহীর সঙ্গে বাক্‌লার লোক দুটিও ছিল। দেখা গেল হলধর এরই মধ্যে গ্রামে রাষ্ট্র করে দিয়েছে—কেমন করে আমরা মোহিনীর হাত থেকে নিস্তার পেয়েছি।

চূড়ামণি সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞাসা করলো—মোহিনী ধরেছিল? আমি হলধরকে দেখিয়ে দিয়ে হাসতে লাগলাম। শালো চিতাটা এমন সব জায়গায় মড়ি নিয়ে যায়—! ও-সব খতরনক্ জায়গা, হলধরের দিকে ফিরে বললো, তুই বাট চিনিস না তো সেখানে গেলি কেন? হলধর জবাব দিল, বাট চিনি না কে বললো? ঠিক জায়গায় তো বাবুকে নিয়ে গিয়েছিলাম, শালো গইলাটাই তো বাট গোলমাল করে দিল। তারপর মোহিনী বাট ভুলিয়ে হায়রান করে তুললো। জানকী জিজ্ঞাসা করলো, মোহিনী দেখেছিস? হলধরের চোখ কপালে উঠে গেল, আরে বাব্বাঃ! সে বাবুকে পুছ না, জান চালি যাবার থাপ হয়েছিল—বলে কিনা মোহিনী দেখেছিস? বাক্‌লার একজন বললো, মোহিনী দেখলে কেউ ফেরে নাকি? আরেঃ বাব্বাঃ! ফেরার আশা ছিল নাকি, মোহিনী তো নিয়েই যাচ্ছিল—শেষে বাঁশী পর্যন্ত বাজালো! বাবুকে পুছ না?

আমাকে কেউ সরাসরি পুছ করতে এল না, ওরা জানে আমার রাইফেলের

শক্তি অনেক, তাছাড়া—বাবু শহরের মানুষ, মোহিনীর কি জানে! জানকী বললো, মোহিনী সবাই দেখতে পায় না, যার কপালে লেখা আছে তাকেই শুধু দেখা দেয়। নইলে তারা তো চার-পাঁচ জনে মিলে গিয়েছিল, সবাই ফিরে এল—এল না শুধু আমার বাপুর বড়-ভাই! হরিণ মারতে গিয়েছিল চার-পাঁচ জনে মিলে, বাপুর বড়-ভাই ছিল বড়-শিকারী। হরিণের রাস্তা খুঁজতে খুঁজতে সেই বড়া-তলাওয়ের জঙ্গলে এসে পড়েছিল। তখন বেলা পড়ে এসেছে। একটা গাছে চড়ে সবাই বসে রইলো, সন্ধ্যার সময় হরিণ বেরুবে বন থেকে, তলাওয়ের ধারে আসবে জল খেতে। আশায়-আশায় সন্ধ্যে হয়ে গেল, তখনও হরিণ আসেনি জল খেতে। সেদিনও ছিল উজালা-রাত। সঙ্গীরা অধৈর্য হয়ে বললো, বাটে ভুল আছে, হরিণ নিশ্চয়ই অন্যদিকে চলে গেছে। জবাবে শিকারী বললো—ভুল হবে কেন, নিজ চোখে বাট দেখেছি যে!

এরপর কথা বলা বন্ধ হয়ে গেল, জঙ্গলের চতুর্দিকে তখন খুট্-খাট্ শব্দ ছড়িয়ে পড়ছিল। কোথাও শুকনো পাতা মাড়ানোর শব্দ, কোথাও ডালপালা ভাঙ্গার শব্দ, আবার কোথাও সামান্য খুট্ শব্দ শুনে শিকারীরা চমকে চমকে বনের দিকে লক্ষ্য রাখতে লাগলো। কিন্তু হরিণের দেখা তখনও পাওয়া যায় নি। দেখতে দেখতে আরও আধ-ঘন্টা সময় চলে গেল, তখন উজালা-রাত ফুটে উঠেছে, দিনের মত তার জ্যোতি। তলাওয়ের জল চকচক করে উঠলো, বনের অন্তরাল থেকে ভেসে আসতে লাগলো কত বিচিত্র শব্দ। এদিকে তখন সন্ধ্যে উৎরে রাত হয়ে গেছে. আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব উঠেছে তুঙ্গে। সাড়া নেই, শব্দ নেই, গুটি গুটি করে এসে দাঁড়াল তলাওয়ের ধারে। বড় হরিণ—জলে ছায়া কাঁপছে, কান ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বনের শব্দ শুনে নিশ্চিত না হয়ে মুখ ডোবাবে না জলে। স্থির হয়ে নিরীক্ষণ করছিল তখন, এমন সময় সঙ্গীরা ফিস্-ফিস্ করে বলে উঠলো, মারো।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল শিকারী—আমার বাপুর বড়-ভাই, ইসারায় জানালো—যখন জলে মুখ ডোবাবে তখনই উপযুক্ত সময়। কিন্তু সঙ্গীদের আর তর সইছিল না, বললো—না, এখনই মারো। দেখছো না চন্‌মন্ করছে, এখুনি পালিয়ে যাবে। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর যদিও বা একটা হরিণ এসেছে, কিছুতেই পালাতে দেবে না। শিকারী বাধ্য হয়ে গুলি ছুঁড়ে দিল। ভীষণ শব্দ হতেই সকলে দেখলো হরিণ টাল খেয়ে জলে পড়ে গেছে। সবাই ভেবে নিল নিশ্চয়ই গুলি লেগেছে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই জল তোলপাড় করে উঠে দাঁড়াল হরিণ। তারপর সকলের দৃষ্টির ওপর দিয়ে কি-রকম এঁকে-বেঁকে বনের মধ্যে কোথায় চলে গেল।

সেই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে সঙ্গীরা এতক্ষণ কথা বলতে পারেনি, হতভম্ব হয়ে শুধু চেয়েছিল। হরিণটা অদৃশ্য হতেই সমস্বরে বলে উঠলো—চালি গিলা, মারো-মারো। কিন্তু শিকারী তখন নিরুপায়, এক-নলা গাদা বন্দুকে একটাই টোটা থাকে, দ্বিতীয় গুলি ছুঁড়তে হলে আবার বন্দুকে বারুদ ভরে ঠাসতে হবে। সুতরাং হরিণটাকে চলে যেতে দেখে শিকারীর হাত নিস্‌পিস্‌ করে উঠলো, অথচ সেই মুহূর্তে করণীয়-ও কিছু নেই। সঙ্গীরা হায়-হায় করে উঠতেই শিকারী কাউকে কিছু না বলে একটা দা হাতে নিয়ে নেমে পড়লো গাছ থেকে, তারপর পড়ি-কি-মরি করে ছুটতে লাগলো আহত হরিণ লক্ষ্য করে। হরিণ ও শিকারী দুই-ই যখন অদৃশ্য হয়ে গেছে, বনের ভেতর কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই, তখন সঙ্গীরা বন্দুকে নতুন করে আবার বারুদ ভরতে লাগলো। তারপর এক সময় জালের-কাঠি ভরে, ক্যাপ পরিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। কোথাও কোন শব্দ হলেই ভাবে বুঝি শিকারী আসছে, আর শিকারীর ফিরে আসা মানেই সঙ্গে হরিণ রয়েছে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করারও একটা সীমা আছে, শেষে সব আশায় জলাঞ্জলী দিতে হল। শিকারী ফিরে এল না।

ক্রমে সেই ভয়ঙ্কর রাত গভীর হল, বনের চেহারা বদলে গেল, রাত-চরা পাখীদের ডাক থেমে গেল। তারপর দেখতে দেখতে সেই-রাত এক-সময় ফর্সাও হয়ে গেল, পূব-আকাশে আলো ফুটে উঠলো। তবু শিকারীর দেখা নেই, বনেও কোন সাড়া-শব্দ নেই। সঙ্গীরা দুর্ভাবনায় আড়ষ্ট-হয়ে গাছের শুক্‌নো ডালে একটা গোটা রাত কাটিয়ে দিল। যদিও পূব-আকাশে উষার আভা ফুটে উঠেছে, তবুও সঙ্গীরা গাছ থেকে নামতে পারলো না—যেমন বসেছিল, তেমনি নির্বাক হয়ে বসে রইলো। ক্রমে পাখীর ডানা ঝাপটানোর শব্দ হল, বন-মোরগের ডাক ভেসে এল। রাতের অরণ্য তখন মুছে গেছে, তবু তার চিহ্ন সর্বত্র ছড়ান, ভোরের বাতাস এসে সেই ঘুম-ঘুমকে যেন দোলা দিয়ে গেল।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীরা তলাওয়ের ধারে এসে দাঁড়ালো, যেখানে গতরাত্রে হরিণকে গুলি করা হয়েছিল। গুলি করার পর হরিণটা জলে পড়ে গিয়েছিল, কোথাও এতটুকু রক্তের চিহ্ন ছিল না। শুধু কয়েকটা অস্পষ্ট টানা-টানা দাগ বনের দিকে চলে গেছে, সেই দাগ ধরে সঙ্গীরা বনে প্রবেশ করলো। বন এমনই একটা জায়গা—সেখানে এলে সব গ্লানি চলে যায়, উৎসাহ ফিরে আসে। সঙ্গীদেরও তাই হল, কোথা থেকে এত উৎসাহ এল তা তাদের

অজানা—পূর্ণ উদ্যমে তখন হরিণ খোঁজা শুরু হল। আঘাত যতই মারাত্মক হোক, সেই হরিণ যদি একবার চার-পায়ে উঠে দাঁড়াতে পারে—তাহলে তাকে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। এ-ক্ষেত্রে আবার অন্য-রকম ধারণা, গুলিটা আদৌ লেগেছে কি-না সে বিষয়ে যথেষ্ট দ্বি-মত ছিল। তবু উত্তেজনায় কোন ভাঁটা পড়লো না। খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেল, তবু হরিণের সন্ধান পাওয়া গেল না। কেউ-কেউ অবাক হয়ে মন্তব্য করলো, এত-বড় জখম নিয়ে হরিণটা কতদূর যেতে পারে! যতই বেলা বাড়তে লাগলো, ততই দলটা কেমন নিরুৎসাহ হয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগলো।

দলের একজন বয়স্ক-লোক সেইসময় হঠাৎ বলে উঠলো, এটা মায়া-মৃগ—বৃথাই খুঁজে মরছি। মায়া-মৃগের গায়ে গুলি লাগে না, লাগলে রক্ত পড়তো, তা সে রক্ত কই? বুড়োর দিকে সকলের দৃষ্টি ফিরলো, অস্বীকার করবার উপায় নেই—চোখে মুখে সন্দেহ ও সংশয় ফুটে উঠলো। গ্রীষ্মকালের বেলা, দেখতে দেখতে তেতে আগুন হয়ে উঠেছে, রাত-জাগা শরীর আর কত ধকল সইতে পারে! নৈরাশ্য আর হয়রানির ক্লান্তিতে দেহ শিথিল হয়ে পড়লো। এমন সময় বনের কোথা থেকে আচম্বিতে হরিণের আর্তস্বর ভেসে এল। হরিণ আহত হয়ে যখন বসে পড়ে আর উঠতে পারে না, আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে করুণ সুরে যে-ভাবে সঙ্গীদের ডাকে, ঠিক সেই স্বর ভেসে এল বনের গভীর থেকে। হরিণের সাড়া পেয়ে মুহূর্তে সকলেই সচকিত হয়ে উঠলো, হরিণের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরেছে সারাটা বেলা। মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লো বন-বাদাড়ের ওপর। এ-বন সে-বন করে চষে ফেললো সমস্ত অঞ্চলটা, কিন্তু কোথায় হরিণ! হয়রান না হলে হরিণ মেলে না, সেই হয়রানীর তখন এক-শেষ হয়েছে।

ক্রমে গভীর বনে গিয়ে পড়লো, সেখানেও হরিণ নেই! সেই ভোর থেকে হরিণ খোঁজা শুরু হয়েছে, সারা সকাল পার হয়ে দুপুর গড়িয়ে গেল—তবু কারো হুঁশ ছিল না। এমন সময় দলের একজন বলে উঠলো, তৃষ্ণায় তার বুক ফেটে যাচ্ছে। ধারে-কাছে কোন ঝর্ণা নেই, সবই তখন শুকিয়ে গেছে, যেতে হবে সেই তলাওয়ের ধারে। তৃষ্ণার কথা শুনে মনে পড়লো—সকাল থেকে পেটে কিছু পড়ে নি, এমন কি বাসি-মুখ পর্যন্ত ধোয়া হয় নি! অমনি সকলেরই তৃষ্ণা পেয়ে গেল, খিদের জ্বালায় পেটের নাড়ী পাক খেতে লাগলো। অবসন্ন শরীর টলে উঠলো, পা আর উঠতে চায় না, শরীরে কোন বল যেন আর অবশিষ্ট নেই। এ-হেন দশায় সমস্ত দলটা পঙ্গুর মত বসে পড়লো সেখানে।

তখন সেই বয়স্ক লোকটি—যে মায়া-মৃগর কথা বলেছিল, সেই আবার মনে করিয়ে দিল। আধখানা দিন শুধু জখম হওয়া হরিণ খুঁজলাম, তার মরণ-ডাক শুনলাম, কিন্তু শিকারীর দেখা এখনও পাওয়া যায় নি—হুঁশ কর সকলে! অমনি সকলের হুঁশ হল, স্বগতোক্তি করে উঠলো অস্ফুট স্বরে, কি ভয়ানক ব্যাপার—শিকারীর কথা বেমালুম ভুলে বসে আছি! তখন বুড়ো লোকটি আবার বললো, মায়াবীরা এমনি একটার পর একটা বিস্মরণ ঘটিয়ে দেয়—শেষে পথ ভুলিয়ে খতম করে দেয়। সেইকথা শুনে গোটা দলটাই যেন ভয়ে শিউরে উঠলো, অজানা আতঙ্ক, বিভীষিকা মুহূর্তে আচ্ছন্ন করে ফেললো। বুড়ো লোকটি বিধান দিল—তলাওতে ফিরে গিয়ে প্রথমে জল খেতে হবে, মুখ-হাত-পা ধুতে হবে, তারপর পরনের কাপড় বাতাসে ঝেড়ে ঘুরিয়ে পরতে হবে। এ না করলে মায়াবীর মায়া কাটবে না। তারপর আর হরিণ নয়, খুঁজতে হবে শিকারীকে!

বনের জন্তু চলাচলের সরু পথ ধরে গুটি-গুটি ফিরে আসছিল তলাও লক্ষ্য করে। আকাশ থেকে যেন আগুন ঝরে পড়ছিল, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো, ফাটা-মাটির বুক চিরে সর্পিল-রেখায় তপ্ত বাষ্প উঠছিল। দু-চোখের ঝাপ্‌সা দৃষ্টিতে সেই তরঙ্গ মরীচিকার সৃষ্টি করতে লাগলো। তলাওয়ের চক্‌চকে জল যেন কত নিকটে এসে থৈ-থৈ করছে। এমন সময় আবার মনে হলো যেন হরিণ ডাকছে, বনের গভীর থেকে পাতায়-পাতায় সেই সকরুণ আর্তনাদ বেজে উঠলো কানের মধ্যে। বুড়ো লোকটি বলে উঠলো,—তাড়াতাড়ি চল, হাত-পা ধুতে হবে, জল খেতে হবে, পরনের কাপড় ঘুরিয়ে পরতে হবে—তলাও আর বেশী দূরে নয়।

সরু পথ, পাশাপাশি হাঁটার উপায় নেই, একের পিছনে দ্বিতীয়—এইভাবে লাইন ধরে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ঘর্মাক্ত মানুষগুলো তলাও লক্ষ্য করে উর্দ্ধশ্বাসে হাঁটছিল। হঠাৎ প্রথম ব্যক্তি ভয়ার্ত শব্দ করে থেমে যেতেই, গোটা দলটা পর-পর পাথরের মত জমে গেল! কি ঘটেছে প্রথম ব্যক্তি ছাড়া তখনও আর কেউ জানে না, কয়েকটা মুহূর্ত কারুর মুখে 'রা' শব্দটি পর্যন্ত ফুটলো না। শুধু চোখে-মুখে ফুটে উঠলো আতঙ্ক ও উত্তেজনা, ক্রমে একটা ফিস্-ফিস্ শব্দ ছড়িয়ে পড়লো লাইনের শেষ-মাথা পর্যন্ত, কি হলো—কি হলো!

তারপর বিস্ফারিত চোখে সবাই একসময় দেখতে পেল। এমন দৃশ্যের জন্য কেউ এতটুকুও তৈরী ছিল না, হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো। একটা ঝাড়ের তলায় শিকারী চিৎ হয়ে পড়ে আছে। মুখ হাঁ-করা, গভীর আতঙ্কে ও যন্ত্রণায়

বড় বড় চোখ দুটো কোটর ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। দলের বুড়ো লোকটি ছিল লাইনের শেষে, ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ঝুঁকে দেখলো। সন্তর্পণে বুকে হাত রাখলো, নাড়ী টিপে দেখলো, শেষে নাকের ডগায় হাতের উল্টো-পিঠ রেখে মাথা নাড়লো। দলের দিকে ফিরে বললো, খতম। ভয়ের একটা চাপা গুঞ্জন উঠলো, একজন সাহস করে জিজ্ঞাসা করলো, কিসে মরলো? দেখা গেল ডান-দিকের কষ বেয়ে রক্তের একটা শুকনো দাগ গলা পর্যন্ত নেমে এসেছে, আর কোন ক্ষতচিহ্ন চোখে পড়লো না।

অত্যন্ত ভয়ে বিপর্যস্ত দলটা মৃত-শিকারীকে ঘিরে নীরবে বসে রইলো। কেউ হাত দুটো নেড়ে-চেড়ে দেখলো, কেউ দু-পায়ে কোন ক্ষত বা আঘাত আছে কিনা লক্ষ্য করতে লাগলো—তবু মৃত্যুর কোন কারণ বোঝা গেল না। মাথায়ও কোন চিহ্ন নেই। এরপর বাকি ছিল বুক ও পিঠ দেখা, কিন্তু সে পরীক্ষা করার সাহস কারো ছিল না। শেষে বুড়ো লোকটি বুকের জামা তুলে ধরলো, সেখানেও কিছু নেই। তাহলে মানুষটা মরলো কিসে? তখন দু-তিন জনে মিলে ধরাধরি করে উপুড় করে দিতেই চোখে পড়লো সেই দাগটা। শিউরে উঠলো সবলে। কোমরের ঠিক ওপরে শিরদাঁড়ায় কালসিটের মত সেই গভীর কালো দাগ। যারা মৃতদেহ উপুড় করেছিল বললো—শিরদাঁড়া ভেঙ্গে গেছে। বড় পাথর ছুঁড়ে মারলে বা শক্ত কিছু দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানার পর যদি রক্তপাত না ঘটে, তাহলে যে গভীর কালো দাগ ফুটে ওঠে—অবিকল সেই দাগ! কিন্তু দাগটা কোন্ আঘাত থেকে এল, কারো মাথায় এল না।

কেউ-কেউ বললো—হরিণ ধরতে গিয়ে পড়ে গেছে। এমন সময় একজন একটা পাথর দেখালো। পাথরটা মাটি ফুঁড়ে বিঘৎ-খানেক উঁচু হয়ে রয়েছে। পাথরটার রং কালো, কিন্তু সেই পাথরটাই যে মৃত্যু ঘটিয়েছে তারও কোন প্রমাণ পাবার উপায় ছিল না, কেন-না—পাথরটার তীক্ষ্ণ মাথায় থেঁতলানো কোন মাংস-পিণ্ড বা রক্তের দাগ লেগে নেই। তবু সকলে হাঁ-হাঁ বলে ঘাড় নেড়ে সায় দিল, বললো—ঠিক-ঠিক, ওই পাথরটার তীক্ষ্ণ ডগায় পড়ে শিরদাঁড়া ভেঙ্গে গেছে। দুর্ভাবনার হাত থেকে রেহাই পাবার তবু একটা কারণ দেখা গেল। কিন্তু বুড়ো লোকটি অন্য-কথা বললো, আঘাতের অন্য কারণও থাকতে পারে, যা আমরা ধারণা করতে ভয় পাচ্ছি বা বিশ্বাস করতে পারছি না। মানুষের মৃত্যু মুগুরের আঘাতেও হয়, আবার সামান্য সূচের-ডগায়ও সম্ভব। মৃত্যু কখন কি রূপ, কি চেহারায় হাজির হয় আপাতদৃষ্টিতে তা বলা সহজ নয়, মৃত্যু-পথ-যাত্রীর

মৃত্যুর ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, তখন আর লুকোনো থাকে না সে কি বেশে এল ! সব ধারণা, সব যুক্তি-তর্কের অতীতে তখন চলে গেছে শিকারী !

যে হরিণটাকে গুলি করা হয়েছিল—সে মাদী। তার মাথায় শিং ছিল না, তবু এ-কথা জানা আছে হরিণের পায়ে যেমন মারাত্মক চাঁট্ আছে, মাথাও তেমনি শক্ত—পাথরের মত। যখন প্রচণ্ড 'ঢুঁ' মারে সে আঘাত মুগুরের মত মারাত্মক ! সামান্য ভেবে তাকে খাটো করা উচিত নয়। সুতরাং নিরীহ পাথরটাকে একা দায়ী করায় কোন সান্ত্বনা নেই, মৃত্যুর-দূতের কোন বিশিষ্ট চেহারা নেই, সে পরিবেশ অনুযায়ী রূপ ধারণ করে !

জঙ্গল ছেলেখেলার জায়গা নয়, পদে-পদে বিপদ আর রহস্য ছড়িয়ে আছে। বুড়োর কথা শুনে সকলের মনের পর্দায় ফুটে উঠলো উজালা-রাতের সেই মায়া-মৃগ। মোহিনী-রূপে তার জল খেতে আসা, তারপর গভীর বন থেকে সেই সকরুণ ডাক—যা মুহূর্তের মধ্যে সব-কিছুর ওপর থেকে বিস্মরণ ঘটিয়ে দেয় ! সেই পাথর-চাপা নীরবতা ভঙ্গ করে বুড়ো আবার স্মরণ করিয়ে দিল, আমাদের তলাওয়ের ধারে যেতে হবে। তখন সকলে ধরাধরি করে শিকারীর মৃতদেহ তলাওয়ের ধারে নিয়ে এল। তারপর মুখ-হাত-পা ধুয়ে, আঁজলা করে জল খেয়ে, পরনের কাপড়গুলো বাতাসে ঝেড়ে ঘুরিয়ে পরলো। বুড়ো বিধান দিল, মোহিনী-পাশ ছিন্ন করার এই নিয়ম !

জানকী উপরি-উক্ত দীর্ঘ ঘটনাটি শুনিয়ে সেদিনের বনের-আসর একেবারে থমথমে করে দিল। চূড়ামণির মত দুঃসাহসী, বাউণ্ডুলে পর্যন্ত চুপ হয়ে গেল। বাক্‌লা-গ্রামের একজন বললো, উজালা-রাতে জঙ্গলে একা যেতে নেই, জঙ্গলের নিরালায় কত অপদেবতা বাস করে। অপদেবতার সঙ্গে মানুষ কি পেরে ওঠে বাবু ! সে খতম করে দেবেই দেবে।

চূড়ামণি এতক্ষণ চুপ করেই ছিল, হঠাৎ বললো—আমার একটা ঘটনা শুনুন : একদিন আসছি ভুরুণ্ডিবাবু হেঁকে জিজ্ঞাসা করলো—হেই চূড়ামণি, তোদের ওখানে হরিণ লামছে ? বললাম, ক-ত্-তো ! সন্ধ্যেবেলা বাড়ি থাকবি, বন্দুক লিয়ে যাবো। আমি 'হাঁ' বলে চলে এলাম। তা, সেই ভুরুণ্ডিবাবু এল কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে। আমি ঠায় রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম, তখন সবে সন্ধ্যে উত্‌রে গেছে। বললাম, এত দেরী করলা বাবু ! ভুরুণ্ডিবাবু জবাব দিল, কাজ সারতে সারতে দেরী হয়ে গেল—তা, হরিণ কি সব বেরিয়ে গেছে ? ক-খ-ন ! সন্ধ্যে লাগার সঙ্গে সঙ্গে সব ফাঁকায় চরা করতে গেছে। ভুরুণ্ডিবাবু রসিকতা করলো,

হরিণদের ভেতর যারা আমার মত দেরী করে, তারা এখনও যায় নি। নে—তাড়াতাড়ি চল্‌।

সেদিনও খুব উজ্জালা ফুটেছিল। ঝোপ-ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে চুপি-চুপি উঁকি দিতে-দিতে চলেছি, কোথাও হরিণ নেই। যে বনে দিনের-বেলা হরিণ দেখা যায়, সেখানেও কিছু নেই। তাজ্জব হয়ে গেলুম, এমন তো কখন হয় না! ক্রমে গভীর বনে গিয়ে পড়লাম আর দৈবাৎ চোখে পড়লো ভুরুণ্ডিবাবুর সেই পিছিয়ে-পড়া একটা হরিণ চরা করে করে খাচ্ছে। বাবুকে বললাম, মারো। নিশানা নিতে গিয়ে দেখলো পাল্লা সামান্য দূর হয়ে যাচ্ছে। টোটার বন্দুক হলে কোন অসুবিধা ছিল না, কিন্তু গাদা বন্দুকে তা হয় না—পাল্লা যত ছোট হবে, মারও হবে তত জোর। তখন ঘুরে ঘুরে বনের আর এক প্রান্তে এসে পৌঁছলাম, ঝোপের-তলা দিয়ে গুঁড়ি-মেরে এগিয়ে যেতেই দেখা গেল—হরিণটা মাত্র কুড়ি-পঁচিশ গজ দূরে রয়েছে।

ভুরুণ্ডিবাবু পুরনো শিকারী, অনেক হরিণ মেরেছে। আধ-মিনিটের মধ্যেই শব্দ হল—গুড়ুম্‌। নির্ঘাৎ জানি হরিণ পড়ে যাবে, কিন্তু বন্দুকের নল থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ায় কয়েক-সেকেণ্ড কিছুই দেখতে পেলাম না, শুধু হরিণ ছুটে যাওয়ার তড়বড় শব্দ কানে এল। ধোঁয়া যখন সাফ হল দেখি হরিণও সাফ হয়ে গেছে। এত কাছ থেকেও হরিণ পড়লো না দেখে খুব রাগ হয়ে গেল, বললাম—কঁড় হলা বাবু? বাবুও পাল্টা প্রশ্ন করে বসলো—কঁড় হলা চূড়ামণি? এখন বোঝ! বাবুও অবাক আমিও অবাক, দু-জনেই তখন বেবাক্‌-বুদ্ধু। বাবু আফ্‌শোস করে উঠলো—নিশানা বিলকুল ঠিক, গুলিও তাজা—তবুও কেন হরিণ পড়লো না বুঝতে পারছি না, এটা কোন জঙ্গল? বললাম, বাবু এত ভাল হরিণের জঙ্গল গোটা মুলুক ঢুঁড়লেও তুমি পাবে না। ঠিক আছে—চল, তোমাকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, বলে আবার হাঁটা দিলাম।

ঝর্ণার ধারে খড়ি-বন। হরিণ আসে জল খেতে আর নুন-মাটি চাটতে। অন্যান্য জন্তুও আসে, তবে হরিণ মারার এমন চমৎকার জায়গা এ-তল্লাটে আর নেই। বিপদের ঝুঁকি অবশ্য কিছুটা নিতে হয়, কারণ—বাঘ জন্ম-শিকারী, জাত-শিকারী—শিকার ধরে তাকে জীবন-ধারণ করতে হয়। মানুষের মত সেও হরিণের পিছু-পিছু আসে, ধৈর্য ধরে ঘাপ্‌টি-মেরে বসে থাকে। সেই বাঘের মুখে পড়লে আর নিস্তার নেই, তখন এক চরম মোকাবিলা হয়। গাইলা আসে, শম্বর আসে, হাতিও কখন-কখন এসে পড়ে। সব তৃণভোজী প্রাণীই নুন-মাটি চাটতে ভালবাসে।

ভুরুণ্ডিবাবুকে নিয়ে সেই বনে প্রবেশ করলাম, বুকের মধ্যে ঢিব্‌ঢিব্‌ করছিল। হঠাৎ অদূরেই বন নড়ে উঠলো, কি জন্তু বুঝতে পারা গেল না। মনে হলো বোধ হয় হরিণ, ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাবুর হাতে বন্দুকটা দু-হাতে বাগিয়ে ধরা, কোন-দিকে বিশেষ নিশানা করা নেই, অর্থাৎ শিকার তখন কোথায় বা কোন-দিকে তার সঠিক আন্দাজ নেই। এ-হেন মুহূর্ত কিন্তু খুব বিপজ্জনক। চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলাম, কিছুই তেমন চোখে পড়লো না। কেবল জোনাকী-পোকারা ঝোপ-ঝাড়ের মাথায় আলো দপ্‌দপিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। ঝিম্‌ঝিম্‌ করে ঝিঁঝিঁ-পোকা ডাকছিল, আর কোথাও কোন শব্দ ছিল না। নীরব নিস্তব্ধ বনে চাঁদের আলোয় যেন ফিনকি ফুটেছিল। এ-হেন পরিবেশে বাবু বিহ্বলের মত দাঁড়িয়ে থেকে হরিণ খুঁজতে লাগলো। ক্রমে বাবুর মধ্যে কেমন একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম, বাবুর সেই ভাবগতিক দেখে কেমন যেন ডর লাগলো। জানিনা, বাবু তখন হরিণের পরিবর্তে আর কোন বিপদের আঁচ পেয়েছিল কিনা। ক্রমে চাঁদের আলোয় বনের আদল্‌ বদ্‌লে গেল।

এমন সময় মাথার ওপর হঠাৎ প্যাঁচা ডেকে উঠলো, আচমকা সেই ভুতুড়ে-ডাক শুনে ভয়ানক শিউরে উঠলাম। প্যাঁচাটা হঠাৎ ডেকে উঠলো কেন, নিশ্চয় কোন অশুভ কিছু দেখেছে! অমঙ্গলের দূত সেই অশুভেরই যেন ইঙ্গিত দিয়ে গেল, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। আর ঠিক সেই সময় ভুরুণ্ডিবাবু চোখ বড়-বড় করে হঠাৎ ফিস্‌ফিসিয়ে উঠলো, চূড়ামণি—ওটা কি? বোঝ বাবু! রাতের-বেলা নাম করতে নেই, যেখানে 'ইয়ের' ভয়—সেখানেই সন্ধ্যা হয়!

এতক্ষণ ধরে বন-জঙ্গল দেখছিলাম, তবু চোখে পড়েনি। হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে দেখা দিল—বাঘ নয়, একটা বউ! এক-গলা ঘোমটা দিয়ে গভীর বনে নিঃশব্দে পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। খড়ি-বনের সেই হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল অঞ্চলে ঘোমটা-ঢাকা সেই বউ দেখে ভয়ানক চমকে উঠলাম। শুধু তাই নয়—ঘোমটার আড়াল থেকে সাদা হাত বাড়িয়ে যেন ইসারায় ডাকছিল। এমন সময় চিক্‌চিক্‌ করে কি একটা পাখী ডেকে উঠলো, কানের পাশ দিয়ে উড়ে যাবার সময় ডানার ঠাণ্ডা হাওয়া পর্যন্ত অনুভব করলাম। গভীর বনে বউ কোথা থেকে আসবে, আর পথ আগলেই-বা দাঁড়াবে কেন?

মুহূর্তে নেশা ছুটে গেল, চিৎকার করে বললাম—ভাগো, চালি যাও—মোহিনী! কিন্তু বাবু এক চুলও নড়তে পারলো না, ভয়ে যেন পাথর হয়ে গেল। আমার গলা দিয়েও আর কোন আওয়াজ বের হল না, আমিও পাথর হয়ে

গেলাম। যদি সে-রাতে পালিয়ে আসতে পারতাম, তাহলে এমন দৃশ্য আর কখনও বোধ করি দেখা হতো না। ও-দিকে তাকাবো না, কিন্তু বারে বারে চোখ কেবল ও-দিকেই চলে যায়। ভয়ে তখন রক্ত জল হয়ে গেছে, কি কুক্ষণেই না বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল! কান্না পেতে লাগলো, গলা বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। বউটা তখন ধীরে ধীরে দুলতে আরম্ভ করেছে, হাত বাড়িয়ে আবার ডাকছিল……! লম্বা হাত-দুটো যেন ক্রমে এগিয়েই আসতে লাগলো!

এমন সময় সেই পাখীটা আবার ডেকে উঠলো, কানের পাশে যার ডানার ঠাণ্ডা বাতাস লেগেছিল—সেই পাখীটা! দেখলাম, সেটা একটা চামচিকে, চাঁদের আলোয় আকাশে হিজিবিজি কাটতে কাটতে সেই বউটার উপর ঝপ্ করে গিয়ে বসলো। অমনি বুঝতে পারলাম এতক্ষণ বউ ভেবে যার ভয়ে মরতে বসেছিলাম, সে বউ নয়—কলাগাছ! ক্রমে আমার দৃষ্টি স্বচ্ছ হলো, সাফ হয়ে গেল। দেখলাম—ঘোমটা নয়, নুইয়ে-পড়া কলাপাতা, হাত বাড়িয়ে কেউ ডাকছিলও না—লম্বা ছড়ার নীচে মোচা দুলছে। চামচিকেটা এসে সেই মোচার-ফুলের উপর বসলো। দারুণ উত্তেজনায়, ভয়ে সারা মুখে মিনমিনে ঘাম জমে উঠেছিল। গামছা দিয়ে মুছে ফেললাম, তবু দু-চোখের তারা থেকে আতঙ্ক গেল না! কোথা থেকে হরিণ ডেকে উঠলো। বাবুর কাঁপুনি তখনও থামেনি, বিড়বিড় করে বললো, শালো উজালা-রাত বড় খারাপ! সে রাতে হরিণ শিকার আর হলো না, মোহিনীর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে এলাম।

কুসংস্কার, অন্ধ-বিশ্বাস আর ভূত-প্রেতে বিশ্বাসী নিরক্ষর জংলী মানুষগুলোর এমনি কত কাহিনী বনের মর্মরে ঘুমিয়ে আছে। যুক্তি—তর্কহীন, অন্ধ-বিশ্বাসে নির্ভর করে ওদের অরণ্যে দিন আসে, রাত হয়। তবু ঘুম ভাঙ্গার দিন বুঝি আজও আসেনি! কোন কেতাবী-বুদ্ধি দিয়েই সেই অনুভূতির ব্যাখ্যা হয় না, জঙ্গলের কাহিনী এমনি বৈচিত্র্যময়। এর যেমন কোন শুরু নেই তেমনি শেষও নেই। আশ্চর্য স্পর্শ-কাতর সেই অনুভূতি—হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য-প্রান্তর, রহস্যময় বন-পাহাড়, আর উপলখণ্ডে দুর্বার নৃত্যরত নামহীন অজস্র ঝর্ণার দুর্ভেদ্য অরণ্য-ভেদ করা অন্ধকার ও উজালা-রাতের কত গোপন অভিসার,—যা এতকাল অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার ও নিরক্ষরতার অন্ধ বুকে লুকিয়েছিল। অলৌকিক মহিমায় নিঃসঙ্গ, নির্জনতার নৈঃশব্দের গভীরে যার আত্ম-লুপ্তি—বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা হয় না। সেই আধি-ভৌতিক, অবাস্তব, অলৌকিক কাহিনীটুকু সভ্যতার বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা দিয়ে চুল-চেরা বিচার করতে মন চায় না!

অরণ্যের সেই রহস্যময়ী অবগুণ্ঠন খুলে তাকে বেচা-কেনার হাটে-বাজারে হাজির করতেও মন সায় দেয় না।

চির-রহস্যময়ী বন-পাহাড়ের আশ্চর্য-অবাস্তব কাহিনী যেদিন ফুরিয়ে যাবে, যেদিন মোহিনী, চুরাইল, বন্‌শী, দাঁড়-কাক আর দক্ষিণ-রায় ও বন-বিবির ইতিকথা মনে পড়বে না, অজানা-অবাস্তব শিহরণে চোখের ভীরু পাতায় কাঁপন ধরবে না, সংশয়ে-উদ্বেগে হৃদয় উদ্বেল হবে না, সেইদিনই বুঝি কিম্বদন্তির ভাঁড়ার নিঃস্ব করে কল্পনার দুঃসাহসিক পাখা চির-বিদায় নেবে।

বাক্‌লার সেই লোকটি বললো—বাবু, উজালা-রাতে যখন কোথাও সাড়া থাকে না, বনের জীব-জন্তুরা পর্যন্ত নিরালায় সরে যায় তখনই মোহিনী দেখা দেয়। অনেকদিন আগে আমাদের গ্রামে এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিল, সেই থেকে উজালা-রাতে কেউ একা বনে যায় না। দু'ভাই গরু চরাতো, বড়-ভাইয়ের বয়স আঠারো আর ছোট-ভাইয়ের চোদ্দ। একদিন গাছতলায় বসে তারা বিশ্রাম করছিল, তখন দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়েছে। গরু-বাছুরগুলো জঙ্গলের কিনারায় ছড়িয়ে ছিল, গলায় বাঁধা কাঠের ঘণ্টার শব্দ গাছপালার আড়াল থেকে ভেসে আসছিল। সেই ঘঙ্-ঘঙ্ শব্দ শুনতে শুনতে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়লো, পাখীরা কল্‌কলিয়ে বাসায় ফিরছিল। গোধূলির রঙে তখন আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে, দু'ভাই গরু তাড়িয়ে ঘরে ফেরার উপক্রম করলো। নিত্য-দিনের কাজ, নিত্য-দিনের বাঁধা পথ—একবার সেই লাইনে গরু-বাছুরদের ঠেলে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত, তারাই তখন ব্যস্ত হয়ে ধাক্কা-ধাক্কি করে ঘরে ফেরার তাগিদে সেই চেনা-পথ ধরে। সেদিনও ঠিক সেই ব্যাপারই ঘটেছিল, রাখালরা পিছন থেকে হো-হা-হ-র-র্ শব্দ করে লাঠি চালনা করে, গরুর ল্যাজ মুলে তাড়া দিচ্ছিল।

হঠাৎ লাল রঙের একটা গরু দল থেকে ছিট্‌কে ল্যাজ তুলে লম্ফ-ঝম্ফ শুরু করে দিল, তারপর আচমকাই দৌড়তে লাগলো জঙ্গলের দিকে। পরিণামে দু'ভাইকেও ছুটতে হলো গরুর পিছনে। লাল রঙের গরুটা আবার গ্রামের মোড়লের। তখনো গাভীন হয়নি, বরাবরই একটু ছটফটে ধরনের। কারণে-অকারণে হঠাৎ-হঠাৎ এমনি খেয়াল-খুশীমত যত্রতত্র ছোটাছুটি করে থাকে। গরুটা গো-চারণের ক্ষেত্রটা বার-দুই পাক দিয়ে সোজা গিয়ে ঢুকলো জঙ্গলে। অগত্যা দু'ভাইকেও চিৎকার করতে করতে তার পিছু নিতে হলো। গরুও ছুটছে, তারাও ছুটছে, খোসামোদ-অনুনয়-বিনয় করে, আদরের কত ডাক ডেকেও

তাকে থামানো গেল না। ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে তার কাঠের ঘণ্টার ঘঙ-ঘঙ শব্দ ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল, তখন দু'ভাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একটা ঝর্ণার ধারে এসে দাঁড়ালো, তারপর মুখে-চোখে জল দিয়ে আকণ্ঠ পান করলো। গরু নিশ্চয়ই এতক্ষণে অন্য কোন দিক দিয়ে গ্রামে ফিরে গেছে ভেবে যেই ঘরে ফেরবার উপক্রম করলো অমনি হঠাৎ কোথায় যেন বাজ পড়লো।

সমস্ত বন কাঁপিয়ে আচমকা ভেসে এল বাঘের গভীর ডাক, আউন্-আউন্......! তখন সন্ধ্যা নেমে আসতে বিশেষ বিলম্ব ছিল না, মাথার ওপর ঘর-মুখো পাখীর পাখার শন্ শন্ শব্দ হচ্ছিল। সূর্যের আলো ফুরিয়ে গেছে। আসন্ন সন্ধ্যায় থমথমে অন্ধকার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এ-হেন মুহূর্তে বনে সেই বাজ পড়লো, বুক-কাঁপানো রক্ত জল-করা সেই গভীর ডাক, আউন্-আউন্! বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে উঠলো, ভয়ে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আসন্ন সন্ধ্যায় অরণ্যের গভীর থেকে বাঘের ডাকে স্নায়ুর ওপর কি ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানে। ছেলে দুটো চকিতে একবার চার-ধার দেখে নিল। বাঘ কোন্‌দিক থেকে ডাকতে ডাকতে আসছিল বুঝতে পারলো না। মনে হচ্ছিল—শব্দটা যে চতুর্দিকেই গম্‌গম্ করে উঠলো। তখন আর দৌড়ে ফিরে যাবার উপায় ছিল না, যে পথ ধরে দৌড়বে হয়তো সে পথ ধরেই বাঘটা আসছে। গভীর বনে বাঘ ডাকলে বিপদ সবদিকেই, যতক্ষণ না তাকে চোখে দেখা যায়। বড়-ভাইয়ের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, দ্রুত সামনের একটা বড় গাছে ছোট-ভাইকে তুলে দিয়ে নিজেও উঠে পড়লো চট্‌পট্। তারপর গামছা দিয়ে ভাইকে গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধে ফেললো, পাছে বাঘ দেখলে ভয়ে নীচে পড়ে যায়।

এরপর বাঘটা কোন্‌দিক থেকে আসছিল দেখবার জন্য দু'ভাই চোখ বড় বড় করে বনের দিকে চেয়ে রইলো। বাঘটা ঝর্ণায় জল খেতে আসছিল, আর তারা ঝর্ণার ধারেই একটা আমগাছে বসে ছিল। সুতরাং কি দারুণ উত্তেজনায় যে সময় কাটছিল তা সহজেই অনুমেয়। বড়-ভাই ছোট-ভাইকে আশ্বাস দিল ভয়ের কিছু নেই, বাঘ এত উঁচুতে উঠতে পারবে না। দেখতে দেখতে রাত হয়ে গেল, তখনও বাঘ জল খেতে আসেনি। উত্তেজনা ও আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে রুদ্ধশ্বাসে বাঘের জল-খাওয়া দেখবার আকাঙ্ক্ষায় পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে ছিল। রক্ত-জমাট করা সেই ভয়ঙ্কর হুঙ্কার তখনও কানের মধ্যে সমানে বেজে চলেছে—যেন গুড় গুড় করে কোথাও মেঘ ডাকছিল।

ক্রমে রাত বাড়তে লাগলো, বনের চতুর্দিক থেকে বুনো জন্তু-জানোয়ারের কত

ভয়ঙ্কর শব্দ ভেসে আসতে লাগলো। ভালুক ডেকে উঠলো, আঁক্-আঁক্ করে. হুড়দাড় করে বন-বাদাড় ভেঙ্গে ছুটে গেল এক-পাল বন-শুয়োর। গুঁড়ি-মেরে হায়না চলে গেল, পাহাড়ের ওপর থেকে ডাকতে ডাকতে শম্বর নেমে আসছিল. হঠাৎ খুব কাছ থেকে চিতল-হরিণ ডেকে উঠলো, টাউ-টাউ করে। ঝর্ণার ওপার থেকে ক্রমাগত কোটরার চিৎকার শোনা যেতে লাগলো। মাথার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে উড়ে গেল বাদুড়। একটা প্যাঁচা অসমাপ্ত ডাক হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল। ভয়াবহ হয়ে উঠলো বন। আর ঠিক তখনই সেই ভয়ঙ্কর নির্জন বনের মাথার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে চাঁদ উঠলো। ভরা-পূর্ণিমার চাঁদ, দিনের আলোর মতই স্পষ্ট আর উজ্জ্বল। জ্যোৎস্না-ধারায় চতুর্দিক আলোকিত হয়ে উঠেছে। বনের গাছপালা, ঝোপঝাড় আর ফাঁকা মাঠের ওপর আর ঝর্ণার রূপালী স্রোতের ওপর যেন থমকে স্থির হয়ে রয়েছে সেই জ্যোৎস্না। যত স্পষ্ট আবার ততই অস্পষ্ট হেঁয়ালীর মত, নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেল বন—কোথাও আর এতটুকু কোলাহল রইলো না। শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা ডাক কানের মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ সুরে বেজে চলেছে।

তখন গভীর রাত, বাঘ জল খেতে আসেনি, হয়তো অন্য কোথাও তৃষ্ণা মিটিয়ে নিয়েছে। অভুক্ত দু'ভাই আড়ষ্ট হয়ে গাছের সঙ্গে যেন মিশে রয়েছে. নড়াচড়া করার সাহসটুকুও নেই—নিশুতি রাত সব অনুভূতি যেন কেড়ে নিয়েছে। ক্লান্তি ও গভীর অবসাদে দেহ-মন তখন জড়পদার্থে পরিণত হয়েছিল, তবু প্রতি রোমকূপে বাঘের সেই গুরুগম্ভীর স্বর তখনও থেকে থেকে যেন সঞ্চারিত হচ্ছিল। অপরূপ বন-জ্যোৎস্নার দুর্নিবার আকর্ষণে ছেলে দুটি ক্রমে বিহ্বল হয়ে পড়লো, দু'চোখে তখন শুধু ভয় আর বিস্ময়! আতঙ্কে কাঠ হয়ে রইলো, এমন ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য আর কখনো দেখেনি!

বড়-ভাই ছোট-ভাইকে আড়ষ্ট গলায় ফিস্‌ফিস্ করে বললো, ভোর হতে আর বেশী দেরী নেই। খুব খিদে পেয়েছে না রে, তেষ্টা পেয়েছে? ছোট-ভাই ফ্যাকাসে শুষ্ক মুখে উত্তর দিল, না। সামনেই ঝর্ণার স্বচ্ছ মিষ্টি-জল রয়েছে, তবু শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে বলতেই হলো—না, তেষ্টা পায়নি। ছোট-ভাইকে একটু খুশী করবার জন্য বড়-ভাই আবার বললো, বাঘটা এল না—এলে দেখতে পেতিস কত কাছ থেকে জল খাচ্ছে! ভোরবেলা ওরা আবার জল খায়, তখন ঠিক দেখতে পাবি—ঘুমুসনি যেন! ছোট-ভাই আড়ষ্ট হয়ে বসেছিল, ঘাড় নেড়ে জানালো—না, সে ঘুমুবে না। বাঘের জল খাওয়া দেখবে।

বাঘ দেখলে ভয় পাবি না তো ?

এতক্ষণে ছোট-ভাইয়ের শীর্ণ মুখে হাসি ফুটে উঠলো, ভয় পাবে কেন ? গাছের ওপর আছে, সঙ্গে দাদা আছে—ভয় কি ! ভয়টা যেন থেকেও রইলো না। ছোট-ভাইয়ের মনে তখন কি প্রতিক্রিয়া চলেছে, তার ভীরু চোখে কি প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে—তা দেখবার বা বোঝবার অবকাশ আর হলো না। খুব ব্যস্ত হয়ে ছোট-ভাইকে নাড়া দিয়ে বড়-ভাই হঠাৎ বলে উঠলো, দ্যাখ্-দ্যাখ্ ! ঝর্ণার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বোবা হয়ে চেয়ে রইলো। বাঘ দেখলেও বুঝি এত অবাক হতো না। অভিভূতের মত দু-ভাই দেখলো—এক পরমা সুন্দরী কন্যা, দুধের মত তার গায়ের রং—সাদা কুয়াশার মত পাতলা একটা ওড়না উড়িয়ে ঝর্ণার ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে। জলের ছপছপ শব্দ নেই, তরঙ্গ নেই, গোড়ালী-ডোবা জলের সেই স্বচ্ছ স্রোতের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এক আশ্চর্য ভঙ্গিমায় হেঁটে আসছিল সেই কন্যা ! বিস্ময়ের ঘোর আর কাটতে চায় না, পলকহীন চোখে দেখলো—পরমা সুন্দরী জলে পা ডুবিয়ে কাশবনের আড়ালে বসলো।

ছেলে দুটি ভেবে পেল না—কাদের বাড়ির মেয়ে ! এত রূপ আগে কখন দেখেনি। অবাক হয়ে চেয়ে রইলো, সে চোখে পলক নেই—ক্লান্তি নেই, স্থান-কাল হুঁশ নেই। রজনীর প্রথম প্রহরে দেখা সেই বন-জ্যোৎস্নার মত অনুভূতি-হীন এক অদ্ভুত আবেশভরা শুধু বিস্ময় আর ভয় ! সর্বাঙ্গ শিথিল-করা এক ভয়ঙ্করী সম্মোহনী শক্তি সেই কাশবনের অন্তরাল থেকে চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল।

ছোট-ভাই হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলো—দাদা, মেয়েটা বোধহয় জানে না—বাঘ এখন জল খেতে আসবে ! বড়-ভাইয়ের কানে সে কথা পৌঁছল কি-না বোঝা গেল না। তখনও ভোর হয় নি। পাখীরা ভুল করে ডেকে উঠতে লাগলো, হরিণ স্থির হয়ে আকাশের চাঁদ দেখছিল, শিরশিরে বাতাস এসে কাশবনে দোলা দিয়েছে। এমন সময় পরমা সুন্দরী কাশবনে গা এলিয়ে শুয়ে পড়লো, ধপ্‌ধপে ওড়না বাতাসে কাঁপছিল। ছোট-ভাই আবার বললো—দাদা, মেয়েটার ঘুম পেয়েছে, যদি বাঘে খায় ! চমকে উঠলো বড়-ভাই, তার দু'চোখের তারায় কি যেন খেলে গেল—ছোট্ট করে জবাব দিল—হুঁ, ঠিক বলেছিস। আমি যাই—বলে নিমেষের মধ্যে নেমে পড়লো গাছ থেকে, তারপর পা টিপে-টিপে কাশবনের দিকে চলে গেল।

ছোট-ভাই গাছের ওপর থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল, দাদা ঝোপের আড়াল নিয়ে গুঁড়ি-মেরে এগিয়ে চলেছে। একেবারে সামনে-না আসা পর্যন্ত মেয়েটি বুঝতেও পারবে না। ক্রমশই দূরত্ব ছোট হয়ে আসছিল, আর মাত্র কয়েক পা বাড়ালেই ধরে ফেলবে মেয়েটিকে। দারুণ উত্তেজনায় সে কেঁপে উঠলো, এমন সময় বনে আবার যেন বাজ পড়লো। 'আউন্' করে ডেকে উঠলো সেই বাঘটা, পরক্ষণেই ভয়ঙ্করভাবে দুলে উঠলো কাশবনটা! চকিতের মধ্যে কি যেন ঘটে গেল সেখানে। ছোট-ভাই রুদ্ধশ্বাসে দেখলো—পরমা সুন্দরী মেয়েটি সেখানে নেই, কাশবন দুলছে আর তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রকাণ্ড আকারের সেই বাঘটা! যে আসন্ন সন্ধ্যায় দু'বার ডেকে উঠেছিল, জল খেতে এসেও আসেনি, দাদা বলেছিল, ভোরবেলা আর একবার আসবে। ঠিক ভোরবেলাই সে এসেছিল! কিন্তু দাদা—! পরক্ষণেই ছোট-ভাই চিৎকার করে উঠেছিল, তারপর তার আর জ্ঞান ছিল না চোখের পর্দায় কখন সব কালো হয়ে গিয়েছিল। দাদার বুকে বাঘটা পা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে—দুঃস্বপ্নের ঘোরে সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে কোথায় যেন তলিয়ে যেতে লাগলো। তারপর কি হয়েছিল মনে নেই—লক্ষ লক্ষ কালো ভ্রমর গুন্‌গুন্ করে তার চেতনাহীন অবশ দেহটাকে যেন পরমানন্দে ব্যথাহীন হুল্ ফোটাতে লাগলো।

কতক্ষণ পরে চোখ মেলে তাকালো। দাদা নেই! ঝর্ণার ধারে, কাশের বনে জ্যোৎস্না যেমন ছিল, ঠিক তেমনটিই রয়েছে। মনে পড়লো পরমা সুন্দরী মেয়েটি কাশবনে হঠাৎ উধাও হওয়ার পরই বাঘটাকে দেখা গিয়েছিল। পরপর সবকথাই মনে পড়লো। পাশের যে ডালে দাদা বসেছিল, সেই শূন্য ডালটার দিকে তাকায় আর ফিরে-ফিরে দেখে কাশের বন। যেখানে দাদার বুকে থাবা তুলে বাঘটা দাঁড়িয়েছিল। অনেক কেঁদেছে, এখন আর কান্না পাচ্ছে না। মনে পড়লো সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে অনেক চিৎকার করে দাদাকে ডেকেছিল, কিন্তু তার গলা দিয়ে কোন স্বর বের হয়নি। ভয়ে সে এমন হয়ে পড়েছিল যে আর কিছু করার সমস্ত সামর্থ্য যেন হারিয়ে বসেছে, বাকি রাতটুকু শুধু কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগলো।

তারপর এক সময় সেই ভয়ঙ্করী রাত পুইয়ে সকাল হলো, সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়তেই প্রাণপণে ছুটতে লাগলো গ্রামের দিকে। দাদাকে বাঘে নিয়ে গেছে সেই দুঃসংবাদটা গ্রামে পৌছে দেবার জন্যই যেন সে বেঁচে রয়েছে। তার পরের ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। কখন গ্রামে পৌছে মাটিতে আছড়ে পড়েছিল

হুঁশ ছিল না, তারপর এক সময় কেঁদে-কেঁদে শুনিয়েছিল গত-রাত্রের সেই ঘটনা। দাদার কথা বলতে বলতে তার কণ্ঠরোধ হয়ে গেল, শেষে বলার মত কোন ক্ষমতাই-আর রইলো না।

নিখোঁজ রাখালের সন্ধানে গ্রামের লোকজন ঝর্ণার ধারে, কাশের বনে কোন পরমা সুন্দরী কন্যার দেখা না পেলেও, দেখেছিল চাপ-চাপ রক্ত আর বাঘের পায়ের টাটকা দাগ। সেই চিহ্নই প্রমাণ করে দিল বড়-ভাইকে বাঘে খেয়েছে। গ্রামের বৃদ্ধ মোড়ল মন্তব্য করেছিল, উজালা-রাতে মোহিনী নির্জন ঝর্ণার জলে স্নান করতে আসে। কোন মানুষ যদি তাকে দেখতে পায় তার আর রক্ষা নেই, মোহিনী মায়ায় তার মৃত্যু হবেই হবে। এরপর বৃদ্ধ মোড়ল গ্রামের মাতব্বরদের চুপি-চুপি বলেছিল আরও একটা ভয়ঙ্কর কথা—ছোট-ভাইও বাঁচবে না।

অবিশ্বাস্য হলেও তার কথা অচিরেই ফলে গেল।

কিছুদিনের মধ্যেই ছোট-ভাইয়ের মনে এক আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে গেল। গভীর আতঙ্ক এসে বাসা বাঁধলো, দিনের-বেলায়ই চোখ বন্ধ করলে যেন দেখতে পায়, সেই পরমা সুন্দরী মেয়েটি জলে পা ডুবিয়ে নাচাচ্ছে, কাশবনের মাথা দুলছে……! ছেলেটি দিন-দিন দুর্বল রক্তহীন হয়ে পড়লো, গ্রামের ওঝা কিছু করতে পারলো না, শেষে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লো। প্রবল জ্বরে বেহুঁশ হয়ে ভুল বকতে লাগলো, বাঘ-বাঘ বলে চিৎকার করে উঠতো। কখনো গভীর মনোযোগ-সহকারে কি দেখতো, তখন চোখের পলক পর্যন্ত পড়তো না—দাদার নাম করে ফিস্‌ফিস্ কি যেন বলতো। লক্ষণ দেখে গ্রামের ওঝা মাথা নাড়তো, আর মাতব্বরদের চোখে-চোখে নিঃশব্দে কি ইসারা খেলে যেত। তারপর এক ভোরবেলা, তখনো পূবাকাশে রং ধরেনি, ঠিক সেই সময়—যে সময় তার দাদাকে বাঘে ধরেছিল, কাশের বনে পরমা সুন্দরী কন্যে হঠাৎ উধাও হয়েছিল, ভোরের সেই মুহূর্তে ছেলেটি হঠাৎ মারা গেল। মরবার সময় চোখ বড় বড় করে বলেছিল—উঃ, কি ভীষণ উজালা! তারপর, দাদা—বলে অসমাপ্ত কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল, শীর্ণ দেহটা পাকে-পাকে বেঁকে দুমড়ে গেল, আর সেইভাবেই শেষ হয়ে গেল।

কতকালের ঘটনা, তবু বলতে-বলতে শেষের দিকে বাকুলার সেই লোকটির গলা ধরে গেল। বললো—বাবু, জঙ্গল মানে শুধু ঝোপঝাড় আর গাছপালাই নয়—তার সঙ্গে আরও কিছু আছে! অনেক বেলা হওয়ায় সেদিনের আসর ভেঙ্গে গেল, চূড়ামণির সঙ্গে বাকুলার লোক দুটি চলে গেল। বাংলোর বারান্দা

থেকেই দেখতে পেলাম ধানক্ষেত পার হয়ে তারা ছোট্ট সেই বনটায় প্রবেশ করলো।

দু-জন নিরীহ, সরল, নিরক্ষর রাখালের অপমৃত্যুর কাহিনী তখনও কানে বাজছিল। জঙ্গলের শুধু হিংস্র জন্তুই নয়, আরও কত-রকমের ভয় যে এদের মনে বাসা বেঁধে আছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। কুসংস্কার, অন্ধ-বিশ্বাস ও নিরক্ষরতার কি ভয়াবহ পরিণাম! জ্যোৎস্না-রাতে অনেকেই চোখে 'ইলিউশান্' দেখে থাকে, সবই কি ভূত-প্রেতের ব্যাপার! আমিও ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামের বাড়িতে 'কলা-বউ' দেখেছি। বাড়ির পিছনের অন্ধকার বাঁশ-বাগানে ভূত-পেত্নীরা থাকতো, নুয়ে-পড়া বাঁশের ওপর বসে দোল খেত, ডোবাতে ঝুপ ঝুপ করে ডুব দিত। রাত্রে ঠাকুর্মার কোল-ঘেঁষে শুয়ে জলের সেই শব্দ শুনতাম, দোল খাওয়ার সময় বাঁশের ক্যাঁচ-কোঁচ, কট্-কট্ শব্দ উঠতো। অন্ধকার বাঁশ-বাগানে দিনেরবেলা যেতেই ভয়ে বুক কাঁপতো, রাত্রি তো দূরের কথা। ঠাকুর্মাও সেই শব্দ শুনে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে ইষ্টনাম জপ করে দিত।

আমার চোখে তখন কিছুতেই ঘুম আসতো না, চোখ বুজে ঘুমিয়ে থাকার ভান্ করতাম। তারও একটা কারণ ছিল। সেই ভয়ে চোখ পিট্‌পিট্ করে মাঝে মাঝে দেখতাম কড়িকাঠ থেকে লম্বা পা মশারীর চালে ঝুলে আসছে কি-না,—তারা কড়িকাঠেও তো থাকতো! শব্দ শুনে বুঝতে পারতাম পেত্নীরা বাঁশবাগানে দোল খাচ্ছে, কেউ ডোবায় ঝুপঝুপ করে ডুব দিচ্ছে। ডোবার পূবদিকে চাটুজ্জেদের বাড়ির গায়ে যে মস্ত তালগাছটা ছিল, যার বয়স কেউ জানতো না—সেই আকাশ-ছোঁয়া তালগাছের মাথায় চড়ে তালপাখার খড়-খড় খড়-খড় শব্দ করে হাওয়া খেত। তার সেই শব্দ শুনে প্যাঁচারা ভয়ানক শব্দ করে ডেকে উঠতো—ক্যাচ-ক্যাচ করে, কচ-কচ-কচ, গায়ে কাটা দিয়ে উঠতো। পান্নাদের তেঁতুলগাছ থেকে সে ডাকতো। হারু পালেদের পুরোতন বাড়িতে মাটির-কাজ হতো—ঠক-ঠক-ঠক শব্দ করে, সেই শব্দও অমনি থেমে যেত। আর ভূতেরা তো মাছ খেতে ভালবাসে, তাই গঙ্গাপালের পুকুরে মাছেরা ঘাই দিয়ে দিয়ে পুকুরময় ছোটাছুটি করে বেড়াতো!

বুঝতে পারতাম ভূত-পেত্নীরা বেরিয়েছে। পান্না, খান্ত, কেষ্ট ও কিশোরদের সঙ্গে দুপুরবেলা ভয়ে ভয়ে বাঁশবাগানে গিয়ে পেত্নীদের কাপাটে-পাঁশুটে রঙের ছেঁড়া-ছেঁড়া চুল দেখে আসতাম। এমন অকাট্য প্রমাণ দেখে মুখে আর কথা সরতো না, তবু ভূত-পেত্নীদের দেখার খুব লোভ ছিল। সেই লোভে ঠিক

দুপুরবেলা সেখানে যেতাম। সবাই বলতো 'ঠিক-দুপুরবেলা ভূতে মারে ঢ্যালা'—যখন সেই ঢ্যালা পড়তো তখন ছুট দিতাম পড়ি-কি-মরি করে।

একবার মরতে-মরতে খুব বেঁচে গিয়েছিলাম, তখন আমার পৈতে হয়নি। সঙ্গীরা বলতো পৈতে থাকলে এক ব্রহ্মদৈত্য ছাড়া আর কেউ কাছে ঘেঁষতে পারে না, কারণ ব্রহ্মদৈত্যেরও তো পৈতে আছে। তাই পৈতের শক্তির সঙ্গে যখন পৈতের কাটাকুটি হয়ে যায় তখন কিন্তু ব্রহ্মদৈত্যেই জিতে যায়!

হাজীর মায়ের ডোবার পাশ দিয়ে যে সরু রাস্তাটা আমাদের ডাঙ্গা-জমির ওপর দিয়ে গেছে, সেই রাস্তার ওপর বর্ষাকালে একটা ভিজে বাঁশ নুইয়ে ছিল। বাঁশটাকে ডিঙ্গিয়ে পার হব বলে যেই পা তুলেছি, অমনি বাঁশটা সট্ করে আকাশে উঠে গেল! বলবো কি—ভয়ে তখন দৌড়বারও ক্ষমতা ছিল না, গলা-বুক শুকিয়ে একেবারে কাঠ—সে এক সাংঘাতিক অবস্থা। পাম্নারা বললো —খুব বেঁচে গেলে ঠাকুর এ যাত্রায়। ভূতেরা অমন করে বাঁশ নুইয়ে রাখে, পার হবার জন্য যেই পা তুলবে অমনি সড়াৎ করে উঠে যাবে আকাশে। জরাসন্ধের মত চিরে একেবারে দু-ফাঁক, নয়তো ছিটকে-ছুঁড়ে ফেলে দেবে একেবারে সেই চাটুজ্যেদের আম-বাগানের ওপাশে! এইসব স্বচক্ষে দেখলে বা শুনলে কার না চোখ ভয়ে ছানাবড়া হয়ে যায়!

মোহিনীর গল্প শুনে ছেলেবেলার কত কথাই না মনে পড়লো, জঙ্গলের মানুষও ছেলেবেলায় এমন কাজ কি দেখেছে বা শুনেছে। আজ যে-সব কথা মনে পড়লে হাসি পায়, কিন্তু ওদের জীবনে তো কোন পরিবর্তন আসেনি! সেই ঝোপ-জঙ্গল, সেই চির-অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত—অন্ধ-বিশ্বাস আর কুসংস্কারকে নিরক্ষরতার আড়ালে সযত্নে শুধু প্রশ্রয়ই দিয়েছে, যা আজ শুধু মজ্জাগতই নয়—কলঙ্ক! ভারতের সব-থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক, অবহেলা আর নাসিকা-কুঞ্চনে চির-তমসাবৃত!

আমিও বনে-জঙ্গলে অনেকবার পথ হারিয়েছি, অনেক অঘটনে স্তব্ধ হয়েছি। জ্যোৎস্না-রাত মনের ওপর অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করে, চোখে 'ইলিউশান্' দেখায়, মুহূর্তে চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতেই কত ভ্রম-বিভ্রান্তি ঘটিয়ে দেয়। কত ছায়া-মূর্তি, কত কাল্পনিক অবয়ব চমকে-চমকে দেয়—সবই 'ইলিউশান্'। কখনো সে গাছের-ছায়া, আবার কখনো বা গাছের পাতার হাতছানি বা আরও সহজতর কিছু।

রাঁচি-লোহারদাগার জঙ্গলে এক ঝর্ণার ধারে এক মানুষখেকো বাঘ আস্তানা

গেড়েছিল, কিন্তু বাঘটাকে মারবার জন্য কেউ সেখানে যেতে সাহস করেনি। জ্যোৎস্না-রাতে ঝর্ণার ধারে না-কি পরী দেখা যেত, অতএব কোন আদিবাসী বা সাঁওতাল পথ-প্রদর্শক জোটেনি যারা শিকারীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। পরে জানা গিয়েছিল, হাওয়া লেগে কাশবন দুলে উঠলেই ঝর্ণার ছিটিয়ে-পড়া জল-কণায় চাঁদের আলোয় মনে হতো—সাদা ওড়না উড়িয়ে পরী নেমে আসছে, বাতাসে সোনালী চুল উড়ছে। আবার এ-ও সত্যি, অনেক ক্ষেত্রে এমন সব আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে বুদ্ধি দিয়ে যার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি। প্রেততত্ত্ব আমার বিষয়বস্তু নয়, তবু এ প্রসঙ্গে কিছু না বললে 'বনমোহিনী' হয়তো সম্যক উপলব্ধি হবে না।

অনেক জঙ্গল-ডাকবাংলোয় আমি অলৌকিক ঘটনা ঘটতে দেখেছি। অনেক ক্ষেত্রে মন-গড়া অর্থ করে নিজেকে বুঝিয়েছি, আবার অনেক ক্ষেত্রে তাও পারিনি। অলৌকিক ঘটনার ওপর অল্প-বিস্তর সকলেরই আকর্ষণ আছে।

সুন্দরবনের বাদা-অঞ্চলে শিকার করতে গিয়ে এমন সব ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি, যার কোন ব্যাখ্যা আজ অবধি খুঁজে পাইনি। যেমন—মানুষ-খেকো বাঘের দ্বীপ, যার দশ-বিশ মাইলের মধ্যে কোন লোকালয় নেই, কোন নৌকা সেই দ্বীপে নোঙ্গর ফেলেনি। সেই নির্জন দ্বীপের চতুর্দিকেই শুধু বিস্বাদ লোনা-জল। বিশাল-বিশাল নদী-নালায় বেষ্টিত। অথচ গভীর-রাত্রে জনমানবশূন্য সেই ভয়াবহ বন থেকে আর্ত-চিৎকার ভেসে এসেছে, বাঁচাও-বাঁচাও...... !* আবার চাঁদনী-রাতে নোঙ্গর বরা নৌকায় তাল-তাল কাদা ছুঁড়ে মেরেছে। যে বন থেকে কাদার-তাল এসে পড়েছিল—সেই বনেই হয়তো কিছুক্ষণ পূর্বে মানুষ-খেকো বাঘ ডেকেছিল! এমন অনেক অজস্র অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছে, আমি কৌতুহলবশত অনেক অভিজ্ঞ পাকা মাঝি-জেলে-কাঠুরে ও মৌলীদের প্রশ্ন করেও কোন বিজ্ঞান-ভিত্তিক জবাব পাইনি বরং আরও অসংখ্য এমনি অবাস্তব অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনিয়েছে, যা অবস্থা-বিপাকে গায়ে কাঁটা দেয়! মনে হতো—মায়ের আঁচল ছেড়ে বেরিয়ে আসা ভুল হয়েছে!

সঙ্কল্পে দৃঢ় হয়ে রইলাম যত ভয়ই আসুক চিতাটাকে মেরে বাকুলাবাসীদের বিপদ মুক্ত করবো। চূড়ামণি আসতেই রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ধানক্ষেত পার হয়ে সেই ছোট্ট বনে—যেখানে সে-রাত্রে হরিণ দেখেছিলাম, সেই

---

* লেখকের 'সুন্দরবনের আতঙ্ক' দ্রষ্টব্য।

বনে প্রবেশ করতেই প্রথম সম্বর্ধনা জানালো একটি বানর ! বেচারা গাছ থেকে নেমে খুব সন্তর্পণে ঘাসের-সুতো খুঁটে-খুঁটে খাচ্ছিল। আমাদের দেখা পেয়েই ভীষণ ভয়ে এক-লাফে গাছে উঠে এ-ডাল-সে-ডাল করে নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে প্রথমে নিশ্চিন্ত হলো। তারপর দন্ত-বিকশিত করে মধুর হেসে মাতৃভাষায় বললো, এ সময় না এলেই কি চলতো না? দেখছো না—সূর্যমামা ডুবুডুবু, এরপর কি আর নামতে পারবো !

ছোট্ট বনটা পার হয়ে পাকদণ্ডি বেয়ে বাকুলার বনে প্রবেশ করলাম। তারপর পশ্চিম-দিকের সেই ঝাঁকালো মহুয়া গাছটার কাছে এলাম, চিতাটা এ-পথেই গ্রামে প্রবেশ করে। বাকুলাবাসীরা জানিয়েছিল—গত রাত্রে চিতা কোন জন্তু মারতে পারেনি। যদি সে প্রকৃতই ক্ষুধার্ত হয়ে থাকে, তাহলে তার গমনা-গমনের পথে অপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। যেহেতু সে টোপ ধরে না, তাছাড়া বাকুলায় টোপেরও নিতান্ত অভাব। সূর্য কোন ফাঁকে গাছপালার আড়ালে নেমে গেছে, দেখতে-দেখতে আব্ছা অন্ধকারে চারদিক ছেয়ে গেল। পাখীদের শেষ কলরব মিলিয়ে গেল। একটা অবগুণ্ঠনবতী নিটোল রাত গুটি-গুটি এগিয়ে আসতে লাগলো দু-চোখের আলো কেড়ে নিয়ে। নীরব-নিস্পন্দ বনভূমি, নৈঃশব্দের গভীর থেকে ঝিঁঝিঁর অস্পষ্ট ডাক ভেসে আসছিল। মহুয়া গাছটা গ্রামের একেবারে শেষ সীমান্তে—বেশী দূরে নয়, গ্রামবাসীদের কণ্ঠস্বর ক্রমে স্তিমিত হয়ে পড়লো। গরুর গলায় বাঁধা কাঠের ঘণ্টার ঘঙ্-ঘঙ্ শব্দ ও কুকুরের ঘেউ-ঘেউ ডাকও আর শোনা গেল না।

ঘন অন্ধকারে নিঝুম-নিস্তব্ধ হয়ে রইলো বন। তখনও চাঁদ ওঠেনি, চূড়ামণি আমার পাঁচ-সেলের টর্চ নিয়ে আমার পিছনে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে ছিল। সেই মোহিনী দেখার রাত্রে চিতাটা যখন টহল দেওয়া শুরু করেছিল, তখন পাখীরা উত্তেজক-ডাক ডেকেছিল, ময়ূর হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল। কোট্রা-হরিণ সতর্ক-সূচক ডাকে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিয়েছিল, এ-রাতে কিন্তু কিছুই ঘটলো না। অন্ধকার বনে কোন সঙ্কেত-ধ্বনি নেই, সাড়াশব্দও নেই। ভূতের মত লম্বা-লম্বা ঝাঁকড়া গাছগুলো ঠায় অন্ধকারে অনড় দাঁড়িয়ে রয়েছে। চূড়ামণির নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে মহুয়ার গন্ধ, মাঝে মাঝে পাখীর ভয়ার্ত-ডাক নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছিল। এক এক রাতের এক এক-রকম রূপ, কখনো সে কোলাহলে মুখর আবার কখনো ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে নিশ্চুপ! যেন গভীর মনোযোগ সহকারে কি অশ্রুত শব্দ শোনবার জন্য অধীর আগ্রহে কান পেতে রয়েছে !

চূড়ামণির তারিফ না করে উপায় নেই, মহুয়া-রস খাওয়া লাল চোখের-কোণে কেমন করে যে এমন তীক্ষ্ণ-প্রখর দৃষ্টিশক্তি লুকিয়ে রেখেছে ভেবে পাই না! ঘোর অন্ধকারেই কি যেন সে দেখতে পেল, সেইদিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করার পর হঠাৎ মনে হলো—কি যেন একটা নড়ছে! জন্তুটা কি তখনও বুঝতে পারিনি, রাইফেল বাগিয়ে ধরলাম। ক্রমে সেই ছায়ার কায়া নজরে এল, একটা হায়না চোরের মত চুপি চুপি মহুয়াগাছের তলায় এসে দাঁড়ালো। ধূর্ত প্রাণীটা কি আঁচ করলো জানি না, পা টিপে-টিপে গ্রামের পথে অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল। দেখা গেল চিতার মত হায়নাটাও দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। ধূর্ত এই কারণেই বললাম—নিজের পায়ের-তলায় সামান্য কাঠি ভাঙ্গার শব্দ শুনে নিজেই চমকে চমকে উঠছিল। এতক্ষণ পরে প্রথম একটি চার-পেয়ে জীব দেখলাম, জানি না চিতাটা কখন আসবে, হয়তো এসেছে—নয়তো……

হঠাৎ জঙ্গল আলো করে চাঁদ উঠে পড়লো। গাছের-মাথা চক্‌চক্ করে উঠলো, তারপর সেই আলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নেমে এল ঘাসের বুকে। হায়নাটা গ্রামের দিকে গেছে প্রায় আধ-ঘণ্টার ওপর, তারপর একটা নাইট্‌জার ডেকে উঠেছিল, আর এতক্ষণ পরে কোন গাছের ডাল থেকে একটা সুর ভেসে আসতে লাগলো, কুক্-কুক্-কুক্-কুক্। এমন সময় গ্রাম থেকে হঠাৎ একটা হল্লা উঠলো, তারপর হো-হা চিৎকারের সঙ্গে জোর টিন পেটানোর আওয়াজ।

প্রথমে ভাবলাম—সেই হায়নাটাকে বোধহয় তাড়া দিচ্ছে, কিন্তু পরক্ষণেই একটা শব্দ শুনে চোখ নীচু করে হঠাৎ দেখতে পেলাম সত্যিই হায়নাটা তীর বেগে ছুটে আসছে। হায়নাটা মহুয়া গাছের নীচ দিয়ে পড়ি-কি-মরি করে পালিয়ে গেল। এত হল্লা আর টিন বাজানোর প্রচণ্ড শব্দের পর চিতাটার আশা ত্যাগ করলাম। এর পর কোন বন্য-প্রাণীই আর এ-মুখো হবে না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইলো না। এখন বাকি রাতটুকু গাছের ডালে বসে কাটাবো না বাংলোয় ফিরে যাবো! কিন্তু হল্লাটা এখনও থামছে না কেন, হায়না তো পালিয়ে গেছে অনেকক্ষণ হলো! চূড়ামণিকে ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করলাম, হল্লা থেকে সে কিছু বুঝতে পারছে কি-না!

সে কান পেতেই ছিল, আমাকে চুপ করতে ইসারা করে আরও কিছু মন দিয়ে শুনে বললো—হ্যাঁ, চিতাটাই এসেছিল! আমার হাসি পেল, সব-কিছুতেই ওরা চিতা দেখছে, যদি না স্বচক্ষে দেখতাম হায়নাটাকে পালিয়ে যেতে! তবুও

চূড়ামণি বললো, হল্লা থেকে সে চিতার কথা শুনতে পেয়েছে। হল্লা কিন্তু তখনও চলছিল। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, সারাক্ষণই রাইফেল হাতে সতর্ক পাহারা দিয়েছি, সে কখন আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গ্রামে ঢুকলো! তারপর ধীরে ধীরে সব শব্দ আবার থেমে গেল। চিতাটা যদি এসেও থাকে তাহলে গ্রামে আসার আরও পথ রয়েছে এবং বলা বাহুল্য সেই পথেই সে এতক্ষণে পালিয়ে গেছে। রাইফেলটা তুলে ধরেছিলাম, নামিয়ে রাখলাম এই ভেবে যে, এতক্ষণ ধরে প্রচণ্ড শব্দ শোনার পর কোন চিতাই তার ধারে-কাছে থাকে না।

অতএব এ রাতের প্রহরার এখানেই শেষ। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার দরুন পায়ের শিরায় টান ধরেছিল, পা ছড়িয়ে সোজা হয়ে বসলাম ও পকেট থেকে সিগারেট বের করে নির্ভাবনায় ধরালাম; চূড়ামণির সিগারেট যখন ধরিয়ে দিচ্ছি—তখনই হঠাৎ 'গেল-গেল'—বলে চেঁচিয়ে উঠলো, সিগারেটটা ঠোঁট থেকে খসে পড়লো। দু'হাতের ফাঁকে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিটা ধরে শুধু চোখ নীচু করতেই দেখতে পেলুম, চিতাটা লাফাতে-লাফাতে গাছতলা দিয়ে চক্ষের নিমেষে চলে গেল! হলধর একদিন বলেছিল, ও চিতা নয়! তাহলে কি? আমার নির্বুদ্ধিতা দেখে কোন জবাব দেয়নি, হাসি-হাসি মুখে শুধু অবাক হয়ে গিয়েছিল।

হতভম্ব হয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমিও চেয়ে রইলাম, অনেকক্ষণ মুখ দিয়ে কোন আওয়াজ বের হয়নি। পড়ে যাওয়া সিগারেটটা কুড়িয়ে নিয়ে চূড়ামণি বোকার মত হাসতে লাগলো। দশ-পনেরো মিনিট ধরে প্রচণ্ড চিৎকার ও টিন পেটানোর আওয়াজের মধ্যে কোন চিতা যে বসে থাকতে পারে ধারণাই করতে পারিনি। নিঃসন্দেহে এটি একটি বিরল ঘটনা!

চিতার সম্বন্ধে যা জানি তা এই রকম—সে রাতের প্রাণী, রাতের অন্ধকারেই তার যা কিছু কাজ-কারবার। যথেষ্ট শক্তিশালী এবং বড় বাঘের মতই বহুদূর শিকার বয়ে নিয়ে যায়। উভয়ের ধরণ-ধারণেও অনেক মিল রয়েছে, তবু চিতার সাহস ঠিক সমান নয়। রুদ্রপ্রয়াগের মানুষখেকো চিতার সম্বন্ধে *জিম করবেট বলেছেন—"মানুষ মেরে মেরে বুড়িয়ে গেলেও চিতাবাঘের ভয় কাটে না, দিনের-বেলায় সে মানুষের সামনে আসতে সাহস পায় না বলে রাত্রি-বেলা সুবিধামত কাজ সারে"। এ-হেন একটি চিতা—যে মানুষখেকো পর্যন্ত নয়, নেহাৎ ই একটা গো-খাদক মাত্র, তার বোধশক্তিও বুঝি কত তীক্ষ্ণ হতে পারে! মানুষের সংস্পর্শে এসেছেই বা কতদিন! চিতাটার এ-হেন দুঃসাহস দেখে অবাক হয়ে গেলাম। এর আগেও আমি অনেক চিতার সংস্পর্শে এসেছি,

তার মধ্যে কেউ কেউ আবার মানুষখেকোও ছিল, কিন্তু এ-হেন পরিস্থিতিতে অর্থাৎ মানুষের নজরে পড়লেই বিদ্যুৎগতিতে পালাতেই তো দেখেছি! হলধরের মত একজন মাতব্বরও বলেছিল; কোন দুষ্ট-আত্মা চিতার ওপর ভর করে গ্রামে উপদ্রব করছে। দুর্ভাবনা হলো—চিতাটা এখনও মানুষকে ভয় পাচ্ছে, কিন্তু দৈবাৎ নরমাংসের স্বাদ পেলে সে ভয় ভাঙতে কতক্ষণ…… ! .

যাই হোক—এখন দেখতে হবে কোন পথে সে এসে প্রবেশ করেছিল আর কোথায় বসে বসে চিৎকার ও টিন বাজানোর শব্দ শুনছিল। তার সেই গোপন এবং সম্ভবত নিরাপদ ঘাঁটির ঠিকানা খুঁজে বার করতেই হবে। এবং তা করতে হলে অপেক্ষা করতে হবে কতক্ষণে গ্রামবাসীরা শান্ত হয়, আগুন নিভিয়ে আবার ঘুমুতে যায়। কারণ—আমাদের এখনই দেখতে পেলে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পাবে, ফলে তাদের পায়ের ছাপে চিতার আসা-যাওয়ার নূতন চিহ্নগুলো মুছে যাবার সম্ভাবনা। সুতরাং ভীড় না বাড়িয়ে বরং যত তাড়াতাড়ি তারা শান্ত হয়ে ঘরে আশ্রয় নেয় সেই আশায় আরও ঘন্টা-খানেক গাছের ডালে চুপচাপ বসে থাকতে হবে।

ধীরে ধীরে অন্ধকার ফিকে হয়ে গেল, ভোরের হাওয়ায় গাছের পাতা কেঁপে উঠলো—পাখীরা এবার ডেকে উঠবে। গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলাম। দু'সারি লম্বা মাটির-বাড়ি, মাঝখানে এজমালি উঠোন, মধ্যে মধ্যে ছাঁচতলা, খড়ের-গাদা, ছোটখাট মরাইয়ের পাশ দিয়ে গোয়াল-ঘরের সামনে এলাম। তখনও গ্রামবাসীরা কেউ ওঠেনি, শেষ-রাতে চিতা তাড়িয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। চূড়ামণি চিতার পায়ের ছাপ খুঁজে বার করলো। দক্ষিণ-দিকের কাটা-বন ঘেঁষে গ্রামে ঢুকেছিল আর তৃতীয় ও চতুর্থ ছাঁচতলার আঁস্তাকুড়ের মধ্যে লুকিয়ে বসেছিল। গোয়াল-ঘরের সামনে কোন চিহ্ন ছিল না, সম্ভবত গ্রামবাসীদের পায়ে-পায়ে নষ্ট হয়ে গেছে। কয়েক জায়গায় খড় ও কাঠি-কুটি জ্বালিয়ে আগুন করা হয়েছিল, হাওয়ায় উড়ে উড়ে ছাই ছড়িয়ে পড়েছে। আগুন নেভানোর জন্য জল ঢালা হয়েছিল, ছোটাছুটির ফলে সেখানে কাদা হয়ে গেছে। আর সেই কাদায় ছাই ও মানুষের পায়ের ছাপ পড়েছে। একটা রোগা কুকুর কোথা থেকে এসে ভ্যাক্-ভ্যাক্ করে দু-বার ডাকলো, তারপর পেটের তলায় ল্যাজ গুটিয়ে সন্দেহ দৃষ্টিতে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। তারপর জড়সড় হয়ে বসে সমানে দেখতে লাগলো কি উদ্দেশ্যে আমরা সেখানে এসেছি, সন্দেহ বা কৌতুহল তখনও তার যায়নি, লাল্‌চে-ঘোর চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে

রইলো। মহুয়া গাছটার গুরুত্বই সব থেকে বেশী চিন্তা করতে করতে বাংলোয় ফিরে এলাম। একটা ধনেশ পাখী তার প্রাগৈতিহাসিক ঠোঁট নিয়ে বাংলোর সামনের একটা গাছে বসেছিল, আমার সাড়া পেয়েই নড় বড় করতে করতে উড়ে গেল। প্রকৃতির বুকে বৈচিত্র্যের শেষ নেই!

সকাল থেকেই মেঘ জমেছিল, দুপুরের পর বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। পাথুরে এলাকায় বৃষ্টির জল বিশেষ দাঁড়ায় না, কাদাও হয় কম। প্রথম বর্ষণে বালি-মাটি যতটা পারে শুষে নেয়, তারপর স্রোত বয়ে যায় নাবাল অঞ্চলের দিকে। তখন মনে হয় যেন অজস্র ঝর্ণা নেমেছে, সাপের মত এঁকেবেঁকে বনের মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে যায়। বর্ষণ শেষে ভিজে বন থেকে কেমন এক ধরনের গন্ধ ভেসে বেড়ায়। সেই গন্ধে বনের পোকা-মাকড়রা কি উত্তেজনায় মুখর হয়ে ওঠে! ঝিঁঝিঁদের ঐকতান বসে যায়, ধাপে-ধাপে সে সুর যখন নিবিড় হয়ে ওঠে, তখন সেই বিচিত্র সুর-যোজনায় উল্লাসে আকুল হয়ে উঠে বন এবং নিঃসঙ্গ মনের ওপর তার প্রভাব যে কত গভীর নির্জন বাংলোয় বসে নিঃসন্দেহে অনুভব করা যায়।

গ্রামের কয়েকজন স্ত্রীলোক পিছনের জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে বাংলোর বারান্দায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। আমি বাংলোয় আছি জেনে তারা নিম্নস্বরে কথা বলছিল। হঠাৎ চিতা কথাটা কানে আসায় ভাবলাম হয়তো তারা চিতাটাকে জঙ্গলের কোথাও দেখে থাকবে, কিন্তু এতদূর থেকে চিতা শব্দটা ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারলাম না। বৃষ্টি ধরে যেতে তারা চলে গেল, কিন্তু 'চিতা' শব্দটায় যে আকর্ষণ রয়েছে তা আমার কান থেকে গেল না। বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই চোখে পড়লো ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে রোদ উঠেছে। সন্ধ্যা নেমে আসতে বিশেষ দেরী ছিল না, কিন্তু দিনের শেষ রশ্মি ভিজে গাছের মাথায় আর একবার ছড়িয়ে দিতে সূর্যের কোন কার্পণ্য ছিল না। বন-মোরগের ভাঙ্গা-ডাক ভিজে বাতাসে বিষণ্ণ শোনালো। সিরীষ-গাছের ডালে একজোড়া ঘুঘু তখন ঠোঁট দিয়ে পালকের জল ঝরাতে ব্যস্ত। ভাঙ্গা মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলতে খেলতে দিন চলে গেল।

ভিজে বনে না যাওয়াই ভাল, মাংসাশী প্রাণীদের কাছে সময়টা খারাপই বলা চলে। সাধারণ নিয়ম—জঙ্গলে খাদ্যাভাব ঘটলেই বন্যপ্রাণীরা গ্রামের লাগোয়া-জঙ্গলে এসে পড়ে। বর্ষাকালে বাঘ সাধারণত বড় জন্তু শিকার করতে চায় না। তার কারণ জলে-কাদায় মড়ি টেনে নিয়ে যেতে অসুবিধা হয়। সেই সময় সব

গৃহপালিত জন্তু সাধারণত গোয়াল-ঘরেই বাঁধা থাকে, বনে চরা করতে যায় না। দেখা গেছে বর্ষাকালে ছাগল, ভেড়া, কুকুরের মত ছোটখাট প্রাণীই বেশী মারা পড়ে। বরকাখানা লাইনে দানিয়ার জঙ্গলে একবার একটা চিতা পুরো বর্ষাকালটাই স্রেফ্ ছাগল-ভেড়া-কুকুরের মাংস খেয়ে কাটিয়েছিল। গ্রামবাসীরা তার কোন প্রতিকার করতে পারেনি।

দুর্গাপূজার ছুটিতে সেবার বলরাম সরকার ও প্রবীর মৈত্রের সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলাম। চিতাটাকে মারবার জন্য গ্রামবাসীরা একটা টোপ পর্যন্ত দিতে পারেনি। দুঃখ করে বলেছিল, চিতাটা সব শেষ করে তবে এখান থেকে গেছে। তখন যে ক'টা ছাগল বেঁচে ছিল সবই গাভিন বা সদ্য বাচ্চা দিয়েছে, আর কুকুর বেঁচে ছিল মাত্র তিনটে। তার মধ্যে একটার কান-কাটা, দ্বিতীয়টার সর্বাঙ্গে ঘা আর তৃতীয়টার বাঁ-পা খোঁড়া।

আমার ধারণা এই বর্ষা-রাতে চিতাটা একান্ত ক্ষুধার্ত না হলে জল-কাদা মাড়াতে চাইবে না। তাছাড়া বৃষ্টি-ধোয়া জঙ্গলে অন্যান্য বুনো-জন্তুরও প্রাদুর্ভাব ঘটে। এ সত্ত্বেও যদি সে আসে আসুক এবং একটা মড়ি করুক। আমি ঘুরে-ঘুরে হয়রান হয়ে পড়েছিলাম; একটা মড়ি পেলে নিশ্চয় তাকে মারতে পারবো, অন্তত সান্ত্বনা পাবার মত কিছু থাকবে। কপাল-ঠুকে তো অনেক রাতই গাছের-ডালে কাটিয়েছি, গ্রামবাসীরা আমার সম্বন্ধে কি ধারণা করে বসে আছে জানি না। এতদিনের চেষ্টায় মাত্র একবারই তাকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল, সে কথা পূর্বেই বলেছি। দু-হাতের ফাঁকে জ্বলন্ত কাঠিটা নিয়ে তাকে দেখেছিলাম চক্ষের নিমেষে চলে যেতে। অতএব গৃহস্থের আর একটা ছাগল নষ্ট হওয়া ছাড়া এর কোন বিকল্প ভেবে পেলুম না।

ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠলো, ঘরে-ঘরে হ্যারিকেন-লণ্ঠনের আলো চোখে পড়লো। চা আর সিগারেট খেতে খেতে বর্ষা-ভেজা নিঃসঙ্গ সেই রাত আমার চারপাশে ঘন হয়ে উঠলো। ঝিঁঝিঁরা অক্লান্ত ডাক ডেকে চলেছে, আর একটা রাত-চরা পাখী অন্ধকারে কোথায় বসে হঠাৎ ডাকতে আরম্ভ করলো —কুক্-কুক্-কুক্-কুক্……।

শব্দহীন কালো-রাত, আকাশের একটা তারাও দেখা যাচ্ছিল না। শীত-শীত করতে লাগলো, বাংলোর হাতায় এক-ঝাঁক জোনাকী দপ্‌দপ্ করতে করতে নীচের জঙ্গলে নেমে গেল। আশ্চর্য নীরব শান্ত পরিবেশ, কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। মাঝে মাঝে গ্রামবাসীদের অস্পষ্ট কথা ভেসে আসছিল।

চিতার ভাবনা তখন পেয়ে বসেছে। গ্রামবাসীরা আমার ওপর অনেক আশা রেখেছিল, কিন্তু আমার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হতে চলেছে। আর বেশীদিন এ-ভাবে থাকাও সম্ভব নয়। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কোটরার ডাক শুনতে পেলাম, তাহলে কি চিতাটা বেরিয়ে পড়েছে! সেই অন্ধকারেই যেন দেখতে পেলাম, বনের সুঁড়ি-পথ ধরে সে আসছে। আসছে সতর্ক দৃষ্টি আর সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে। হলুদ বর্ণের ওপর গোল-গোল কালো ছোপ দেওয়া অপূর্ব শরীরটা আশ্চর্য কৌশলে গুটিয়ে অন্ধকারে মিশে রয়েছে। শূন্য বন, কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই, কোন হুঁসিয়ারী ডাক নেই, বন-বাদাড় ভেঙ্গে আচমকা ছুটে যাওয়া কোন হট্টগোলও নেই। নিঝুম নিস্তব্ধ ভিজে বন। পাতায় সঞ্চিত বৃষ্টির জল বাতাসের বেগে ঝরে পড়ছে টুপ্ টুপ্ শব্দ করে। চিতারা আবার জল বিশেষ পছন্দ করে না। কিন্তু ক্ষুধার্তের কোন পছন্দ-অপছন্দ থাকতে নেই। দু-চোখে সেই ধ্বক্-ধ্বকে আগুন নিয়ে সে আসছে পশ্চিম-দিকের বন থেকে। মহুয়া-গাছের নীচ দিয়ে তার পথ……সেই পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই রাত পুইয়ে গেল।

আমি দুটো খবরের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিলাম। প্রথমত সত্যই সে রাতে চিতাটা এসেছিল কি-না, আর দ্বিতীয়ত কবে গ্রামবাসীরা হাঁকোয়া করবে। এমন সময় টিলার নীচে গ্রাম থেকে হঠাৎ একটা চেঁচামেচির শব্দ কানে এল। বারান্দায় ঝুঁকে দেখতে পেলাম কয়েকজন গ্রামবাসী বেশ উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা বলছে। সোরগোলটা বেশী তুলছিল স্ত্রীলোকেরা। ছোটখাট একটা দল জানকীর ঘরের সামনে জড় হয়েছিল এবং সকলেই হাতমুখ নেড়ে কিছু বলছিল। সকলেই যেখানে বক্তা, সেখানে শ্রোতার ভূমিকা বিশেষ থাকে না। সকলেই তখন একে অন্যের কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করে হাত-মুখ-চোখ—এই তিন প্রধানের সমন্বয় ঘটিয়ে কোন দারুণ চাঞ্চল্যকর তথ্য পরিবেশনে ভীষণ ব্যস্ত। স্ত্রীলোকদের মধ্যে কয়েকজনের শাড়ি আবার জলে-ভেজা, মনে হলো যেন সদ্য পুকুরঘাট থেকে উঠে এসেছে। পুরুষেরা ছোটাছুটি করছিল, তাদের হাতে আবার লাঠি-টাঙ্গি। আর সেই হট্টগোলের মাঝে গ্রামের আলসে কুকুরগুলো হঠাৎ দারুণ চটপটে হয়ে তার স্বরে গলা মিলিয়েছে।

হট্টগোল ক্রমশ তুমুল আকার ধারণ করায় মনে করলাম বোধহয় কোন ঝগড়া বেধেছে এবং তার প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে দু'পক্ষের বাদানুবাদ শুরু হয়েছে। এরপর রে-রে করে লেগে যাবে মারপিট, একটা রক্তারক্তি কাণ্ড না ঘটে যায়!

এমন সময় চোখে পড়লো জানকী ছুটতে ছুটতে আসছে, দু-পা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে, ব্যাপার কি? জানকী হাঁফাচ্ছিল, বললো—জলদি বন্দুক নিয়ে আসুন, একটা দাঁতাল-বরা মেয়েলোকদের তাড়া করেছে। তৎক্ষণাৎ বন্দুকে দুটো এল. জি. গুলি ভরে নিয়ে দীঘির দিকে ছুটলাম। স্ত্রীলোকেরা সরে গিয়ে পথ করে দিল। দীঘির পাড়ে পৌঁছেই দেখি উত্তেজিত জনতা, পাঁচ-সাতটা কুকুর আর দীঘির জল ছেড়ে উঠে-পড়া একঝাঁক বিভিন্ন জাতের পাখী গলা খুলে ডাক ছেড়েছে। উত্তর-দিকের বন দেখিয়ে জানকী বলে উঠলো, দাঁতালটা ওখানেই লুকিয়ে পড়েছে। মেয়েরা স্নান করবার জন্য জলে নেমেই হঠাৎ দেখতে পায় দাঁতালটা এক-গলা জলে নেমে শাপলা খাচ্ছে। জল ছিটিয়ে তাড়া দিতেই খাওয়ায় বিঘ্ন ঘটায় দাঁতালটা হঠাৎ রেগে ওঠে ও ছুটে এসে আক্রমণ করে বসে। যারা জলে ছিল আরও গভীর জলে চলে গেল, আর ডাঙ্গার সকলেই গ্রামের পথে ছুটলো খবরটা দেওয়ার জন্য। মেয়েরা দেখেছে দাঁতালটা শেষ পর্যন্ত দীঘির উত্তর পাড়ের জঙ্গলে উঠেছে।

মস্ত শিমূল গাছটা দেখিয়ে বললাম, ওর পাশে আমি থাকবো, আর গ্রামবাসীরা দীঘির পাড় থেকে ঢিল ছুড়ে—হল্লা করে দাঁতালটাকে তাড়াবে। যদি ফিরে আক্রমণ করে তাহলে যেন মেয়েদের মত জলে নেমে পড়ে। দীঘির উত্তর-পাড় ধরে দৌড়ে শিমূল গাছটার পাশে এসে দাঁড়ালাম, তারা ততক্ষণে প্রচণ্ড হল্লা তুলে, ঢিল ছুড়ে দাঁতালটাকে আমার দিকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো।

প্রায় আধ-ঘণ্টা ধরে সমানে হল্লা আর ঢিল ছোড়া চলতে লাগলো, তবু দাঁতালটা বেরিয়ে এল না। শেষ পর্যন্ত হয়তো ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে, ঝুঁকি খানিকটা নিতেই হবে। যেই এই কথা ভেবেছি অমনি দেখলাম সামনের ঝোপ নড়ছে। দাঁতালটা নিঃশব্দেই আসছিল, হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়েই ক্রুদ্ধ গর্জন করে ঝোপ-জঙ্গল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতেই ঝোপটা দারুণভাবে নড়েচড়ে উঠলো। তার পরেই দেখতে পেলাম মূর্তিমান একেবারে আমার সামনে এসে হাজির। দূরত্ব মাত্র কুড়ি-পঁচিশ হাত, এত কাছ থেকে অতবড় জানোয়ারটাকে এল-জি-র পিলেট্ থামাতে পারবে কি-না সন্দেহ হলো। আমার কাছে তখন কোন বুলেট ছিল না, কাজে-কাজেই বন্দুকটা তুলে ধরলাম। এই সামান্য নড়াচড়া দেখেই সে ক্ষেপে উঠলো, তার পর ধেয়ে এল তীব্র বেগে। নিশানা নেওয়াই ছিল, সুযোগ বুঝে ঘোড়া টিপে দিলাম। এল. জি. গুলিটা

যে এত চমৎকার কাজ করবে ভাবতে পারিনি, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল দাঁতালটা। তার পর ধীরে ধীরে আবার উঠে দাঁড়ালো বিহ্বলের মত। দাঁতালটাকে আবার উঠে দাঁড়াতে দেখেই আমার বুক শুকিয়ে গেল, বন্দুকে আর একটিমাত্র গুলি অবশিষ্ট আছে। খুব কার্পণ্যের মত সে গুলিটাও ছুড়ে দিলাম তার মাথা লক্ষ্য করে। সেই যে পড়ে গেল আর নড়লো না, তার নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে ফোঁটায়-ফোঁটায় রক্ত বেরিয়ে এসে সাদা দাঁত দুটোকে রাঙিয়ে দিল।

বেশ বড় দাঁতাল, পরে দাঁত দুটো খুলে মেপে দেখেছিলাম সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, আজও সযত্নে রেখে দিয়েছি। ছয়-ইঞ্চিই হচ্ছে সর্বোচ্চ রেকর্ড। গুলির শব্দ শুনে গ্রামবাসীরা দৌড়ে এসে দাঁতালটাকে ঘিরে দাঁড়ালো, তারপর যে যার খুশি মত মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলো। এতবড় দাঁতাল এর আগে তার মারা পড়েনি, সুতরাং খুশীর আর অন্ত রইলো না, কত মাংস হবে গা টিপে-টিপে দেখতে লাগলো।

চূড়ামণি বাক্‌লায় গিয়েছিল, বাক্‌লায় ওর শ্বশুরবাড়ী। দু'জন স্থানীয় শিকারকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসেই শুনেছিল দাঁতাল মারা পড়েছে। মাংসের সেই ভাগ নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। দেখলাম শিকারীরাও মাংসের ভাগ পেয়েছে, তার পর চিতা ও হাঁসোয়া নিয়ে আমাদের কথাবার্তা চলতে লাগলো।

বাক্‌লার শিকারী বললো, চিতাটা উপদ্রব করছে প্রায় দু'মাসের ওপর। এই সময়ের মধ্যে সে মেরেছে বড় গরু একটা, বাছুর দুটো, ছাগল মেরেছে সাতটা আর কুকুর মেরেছে তিনটে। এ-ছাড়া বড় মোরগও নিয়ে গেছে বেশ কয়েকটা।

প্রথম গরু মারার গল্প ওরা এইভাবে বললো—তখন চাষ উঠে গেছে, সামান্য কিছু জমি বেড়া দিয়ে ঘিরে ছোলা, সরষে আর আখ দেওয়া হয়েছিল। বাকি সব জমি তখন ফাঁকা, বেশ বড় বড় ঘাস গজিয়ে উঠেছিল। চাষের সময় গরু-বাছুর বেঁধে রাখতে হয়, নইলে ফসল নষ্ট করে দেবে। তা তখন তো চাষ উঠে গিয়েছিল, তাই গরু-বাছুরও ছাড়া পেয়ে দিব্যি মনের আনন্দে চরে-চরে মাঠের ঘাস খাচ্ছিল। বিকাল তখন পাঁচটা কি সাড়ে-পাঁচটা, রাখালরা গরু-বাছুর তাড়িয়ে ঘরে ফিরছিল। গরুর ক্ষুরের ধুলোয় আকাশের পড়ন্ত আলো তখন গোধূলির রঙে রাঙা হয়ে উঠেছে। নিস্তব্ধ আসন্ন সন্ধ্যা—শুধু ঘরমুখো পাখীদের ক্লান্ত ডাক ভেসে আসছিল। দিনান্তের মরা-আলোয় বিষণ্ণ বেলা, ছায়ার গভীরে অন্ধ আকুলতা, কোথাও কোন কোলাহল নেই—নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে ফুরিয়ে আসছিল দিন ধীরে ধীরে।

এমন সময় সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে রাখালদের একটা তীব্র চিৎকার শোনা গেল। চিৎকারটা উঠেছিল গ্রামের লাগোয়া জঙ্গলের ধার থেকে। সুতরাং অনেকেই কৌতূহলী হয়ে দেখতে গেল। গরু-বাছুরগুলো তখন মরীয়ার মত হুড়মুড় করে গ্রামের গলিপথে ঢুকে পড়েছে। নাকের ফোঁস-ফোঁস শব্দ করে, ল্যাজ খাড়া করে তড়বড় করে ছুটে আসছিল। কোনরকমে পাশ কাটিয়ে মাঠের ধারে আসতেই দেখলাম, শূন্য মাঠ! শুধু একটা গাই-গরু সেখানে অন্ধের মত চক্কর দিয়ে ঘুরছে, আর তার পিঠের ওপর বসে রয়েছে একটা চিতাবাঘ! বিশ্বাস করা শক্ত, তবু দেখলাম—সেই সাংঘাতিক সওয়ারী নিয়ে গরুটা বে-দম হয়ে ঘুরছে গোল হয়ে। আমরা প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলাম, আর সেই চিৎকার শুনে গরুটা পরিত্রাণ পাবার আশায় প্রাণপণে ছুটে আসতে আসতে হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। এত লোকজন দেখে চিতাটাও ভড়কে গিয়ে লাফিয়ে বনের মধ্যে চলে গেল। শিকারীরা বলতে লাগলো—আমরা না থাকলে চিতাটা ওকে ছাড়তো না, ওখানেই মেরে ফেলতো।

যাই হোক—দেখা গেল গরুটার পিঠ দিয়ে প্রচুর রক্ত ঝরে পড়ছিল। গাছ-গাছড়ার মূল বেটে গরুর ঘায়ে লাগিয়ে দেওয়া হলো, তারপর পাট দিয়ে শক্ত বাঁধন দিতেই রক্ত পড়া বন্ধ হলো। গরুটা তখন যন্ত্রণায়-ভয়ে চোখ বড়বড় করে ঘন ঘন শ্বাস ফেলছিল, সমস্ত শরীরটা কাঁপছিল থরথর করে। পা ভেঙে যাওয়ার দরুন তার উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না. সারারাত আগুন জ্বেলে পাহারা দেওয়া হলো—তবু তাকে বাঁচানো গেল না। রাত গভীর হতেই চিতার ডাক জঙ্গলের চতুর্দিকে ঘুরে ফিরতে লাগলো। এইভাবে তিন রাত্রি পাহারা দেবার পর পেট ফুলে মরে গেল গরুটা।

এর পর চিতাটাকে আর দেখা যায়নি, তবু প্রায় প্রত্যেক রাত্রেই কুকুর ডেকেছে, আবার কখন কখন তার পায়ের পরিষ্কার ছাপও চোখে পড়েছে হঠাৎ একদিন আকাশ ঘোর হয়ে ঝিম ঝিম করে বৃষ্টি পড়া শুরু হলো, তার সঙ্গে জোলো হাওয়া। পাহাড়ী এলাকা অঞ্চলেই যেমন গরম তেমনি ঠাণ্ডা। তা-সেই জোলো-হাওয়া এমনি কাঁপিয়ে দিল যে সন্ধ্যার পর কেউ আর ফাঁকায় রইলো না। ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে কুপি জ্বালিয়ে আরামে হাত-পা গুটিয়ে বসে রইলো। অসময়ের বৃষ্টি—হঠাৎ থেমে গেলেও শির-শিরে ঠাণ্ডা বাতাস সমানে বইতে লাগলো। সেই দুর্যোগের অবসরে কখন চিতা গ্রামে ঢুকে পড়েছিল কেউ জানতেও পারতো না, যদি না কুকুরগুলো সজাগ থাকতো। বাতাসে চিতার

গায়ের গন্ধ পেলেই কুকুরগুলো ছোটাছুটি করে পরিত্রাহী চিৎকার শুরু করে দিত।

তখন অনেক রাত হয়েছে, হঠাৎ কুকুরগুলো ভীষণ ডাকাডাকি করতেই কেমন সন্দেহ জেগেছিল, কিন্তু চিতাটা যে সেই দুর্যোগেই গ্রামে হানা দিতে এসেছে সে কারুর বিশ্বাস হয়নি। আবার এমনও হতে পারে সেই ঠাণ্ডায় ঘরের উষ্ণতা ছেড়ে জল-কাদা মাড়াবার ইচ্ছা কারুর ছিল না। কুকুরগুলো কিন্তু সমানে ডেকে গেল প্রায় আধ-ঘণ্টা ধরে, তারপর নিস্তেজ হয়ে কোথাও কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লো। আর হাঁক-ডাক শোনা গেল না। নিস্তব্ধ কালো রাত্রির বুকে হু-হু করে বাতাস বইতে লাগলো।

পরের দিন সকাল হলো। পরিষ্কার নীল আকাশ, কোথাও মেঘ নেই—জোলো-বাতাস নেই। ঝক্‌ঝকে রোদে সকলেই বেরিয়ে এল এবং যথারীতি কাজে-কর্মে লিপ্ত হয়ে গেল। জলধরের বউ ঘরের বাসিপাঠ সেরে গোয়াল-ঘরের ছিটে-বেড়ার আগল ঠেলে ভিতরে ঢুকতে গেল গরুটাকে মাঠে বেঁধে রাখবে বলে। কুঁচলা পাতা খেয়ে খেয়ে গরুটার দুধ কমে গেছে, হলুদ আর বড় কড়ির একটা মাদুলী গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে জলধরের বউ। আগলটা তার দিয়ে জড়ানো ছিটেবেড়ার তৈরী, ঠেলে ঢুকতে হয়, ছেড়ে দিলেই আপনা হতেই বন্ধ হয়ে যায়। তখন ভিতর থেকে না টেনে আর বেরুনো যায় না। জলধরের বউয়ের তখন অনেক কাজ, একা মানুষ, একটা ছেলেপুলেও হয়নি। মরবার ফুরসৎ পায় না সারাদিন, তাড়াতাড়ি আগল ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়েছিল আর কি! হঠাৎ মুখ বাড়িয়ে থমকে গেল, ওটা কি! পরক্ষণেই পড়ি-কি-মরি করে বেরিয়ে এসে আতঙ্কিত গলায় বাবা-গো—মা-গো বলে প্রচণ্ড চিৎকার শুরু করে দিল। আগলটা ইতিমধ্যে ছাড়া পেয়ে ক্যাঁচ-কোঁ শব্দ করে আপনা আপনিই আবার বন্ধ হয়ে গেল যথারীতি।

জলধরের বউ ততক্ষণে পরিত্রাহী চিৎকার করতে করতে উন্মাদিনীর মত গ্রামের মাঝখানে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অনেকেই যারা আশপাশে কাজে-কর্মে ব্যস্ত ছিল ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলো—কঁড় হ'লা বউ? বলবে কি! তখন তো প্রায় বাক্-রোধ হয়ে আসছিল, থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে আকুল নয়নে খুঁজে দেখলো আসল মানুষটাই নেই! জলধর তখন মাঠে গিয়েছিল। আতঙ্কিত বোবা গলা থেকে একসময় গোঙানির মত একটা অস্পষ্ট কাঁপা-কাঁপা শব্দ নির্গত হলো, 'বা-আ-ঘ'!

ব্যস, আর যাবে কোথায়! মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে গেল উঠোন, ঘরের দরজা

বন্ধ হওয়ার শব্দ হতে থাকলো, দড়াম-দড়াম। তার পর লাঠি-সোঁটা হাতে জানলার ফাঁকে-ফোকরে জোড়া জোড়া তীক্ষ্ণ চোখ উত্তেজনায় জ্বলে উঠলো, কোথায় বাঘ! ছেলে-ছোকরার দল রৈ রৈ শব্দে চিৎকার শুরু করে দিল। সেই প্রচণ্ড হুল্লোড়ের মধ্যে নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ আর্ত বিলাপ ধ্বনি ভেসে এল, মোর গইলা-ঘরে গুটে—শেষের কথাগুলো আর শোনা গেল না, পুরুষ মানুষেরা হৈ হৈ করে এসে পড়লো। তার পর জলধরের বউকে খুঁজে বার করে জিজ্ঞাসা করলো, কোথায় বাঘ! জলধরের বউ জবাব দিল, মোর গইলা-ঘরে। এতক্ষণে জলধরের বিব্রত ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল, বাঘ আসিলা কেমতি! কিন্তু শ্রীমতি কেমতির বিবরণ জানে না, ঘটনাটা ঘটেছে জোলো হাওয়ার সেই রাত্রিতে। অতএব বুক চাপড়ে আর একপ্রস্থ রোদন করে উঠলো—মোর গাইটা, মোর সোনাটা······

গ্রামের সাহসীরা গুটি-গুটি করে দেখে এল—সত্যিই গোয়াল-ঘরের কোণে বাঘ বসে আছে! তখন রীতিমত সিরিয়াস্ আলোচনা বসে গেল কিভাবে বাঘ মারা যায়। গরুটা তখনও জীবিত, অতএব গরুটা বাঁচিয়ে বাঘ মারা সহজ ব্যাপার নয়, বাঘটা গুলি খেয়ে যদি গরুটাকেই মেরে বসে! মুশকিল আসান করলো বুড়ো মোড়ল, বললো—বুকুন বড় শিকারী, গইলা-ঘরের চালে উঠে এক গুলিতে খতম্ করে দিক।

কথামত বুকুন চালে উঠলো। চালটা আবার শুকনো তালপাতা দিয়ে ছাওয়া, হাত দিলেই খড়মড় শব্দ হয়। অতএব বাঘকে জানিয়ে শুনিয়েই এ-কাজ করতে হবে! অনেক কষ্টে বুকুন একখানা পাতা সরাতেই অনেকটা ফাঁক হয়ে গেল, উঁকি মেরে দেখলো সেই হট্টগোলে ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে বাঘ কোণ নিয়েছে। গাদা বন্দুকটা সেই ফাঁকে গলিয়ে তাক করতে গিয়েই ঘটলো উল্টো বিপত্তি, কোণঠাসা বাঘ দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো। যে বুকুনের শিকারী হিসেবে অত নাম, সেই বুকুনের আত্মারাম পর্যন্ত খাঁচা-ছাড়া! তড়াক করে লাফিয়ে মাটিতে পড়েই বলে উঠলো বাবা-রে! বাঘও অমনি সেই তালপাতা সরানোর ফাঁক দিয়ে লাফিয়ে উঠলো, তার পর শিকারীকে উজীয়ে অল্প একটু দূরে লাফিয়ে নামলো হাল্কা পায়ে। তার পর আর কি—মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল কমসে কম তিরিশ চল্লিশ জোড়া উৎসুক চোখের সামনে দিয়ে·····।

বাক্‌লার শিকারী বললো, শয়তানরা তো এভাবেই বুদ্ধিভ্রম ঘটিয়ে চোখের সামনে উধাও হয়ে যায়! বাঘটা নিজেই নিজেকে বন্দী করে মৃত্যুকে ডেকে এনেছিল।

এই ঘটনার পর সকলের ধারণা হলো বাঘটার খুব শিক্ষা হয়েছে, সহজে আর গ্রামে ঢুকবে না। কিন্তু বাকলার শিকারী বললো, ভুল! শিক্ষা তার মোটেই হয়নি, বরং আরও মরীয়া হয়ে উঠলো। একদিন দিনেরবেলা এক-মাঠ লোকের সামনেই একটা ছাগল ধরে নিয়ে গেল।

সেদিন আমরা ক্ষেতের আল কাটছিলাম, ক্ষেতের ধারেই জঙ্গল। সেই জঙ্গল থেকে হঠাৎ ছাগল চিৎকার করে উঠলো। ডাকটা শুনেই মুখ তুলে দাঁড়ালাম কিন্তু ছাগলটাকে কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। পরক্ষণেই সে পরিত্রাহী চিৎকার করে উঠলো এবং তীব্রবেগে জঙ্গল ভেঙ্গে আসছিল তার শব্দও কানে এল। কোদাল রেখে উঁচু আলের ওপর দাঁড়িয়ে ছাগলটাকে দেখবার চেষ্টা করলাম, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখা গেল ঝোপঝাড়ের ওপর দিয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে প্রাণপণে ছুটে আসছে। ভাবলাম—বোধ হয়, শিয়াল কিম্বা হায়না তাড়া করেছে। ক্রমাগত ডাকতে ডাকতে জঙ্গল পার হয়ে ফাঁকায় এসে পড়তেই দেখতে পেলাম ছাগলটাকে। উঁচু বন থেকে সে আসছিল, আর কয়েকটা ধাপ নীচে নামলেই ক্ষেতের ও-প্রান্তে এসে পড়বে ও বেঁচে যাবে। কারণ—এত ফাঁকায় আর লোকজনের সামনে এসে ধরা কোন শিয়াল বা হায়নার সাহসে কুলোবে না। ছাগলটা শেষ ধাপে নেমে এসে ক্ষেত লক্ষ্য করে লাফ দিল।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম, যাক এ-যাত্রায় বেঁচে গেল ছাগলটা। শূন্য থেকে নেমে আসছিল যে, তখনও মাটি স্পর্শ করেনি। হঠাৎ সেই ধাপের নীচ থেকে চিতার একটা মাথা বেরিয়ে এল এবং মাটি স্পর্শ করার পূর্বেই সেই শূন্যেই ছাগলটাকে যেন লুফে নিল। ছোঁ মেরে গলাটা কামড়ে ধরেই ভাঙ্গা জমির আড়াল দিয়ে কোথায় চলে গেল! এক লহমার মধ্যে ঘটে গেল, এত দ্রুত আর আচমকা অদৃশ্য হয়ে গেল ছাগলটা যে, আমরা কিছু বুঝতে পারলাম না। চিতাটা কখন এল তাও চোখে পড়েনি, এ থেকেই অনুমান করুন—জঙ্গলের প্রতি ইঞ্চি জমি তার কত চেনা, সে ঠিক জানে কোন্ পথ ধরলে শিকারের কাছে দ্রুত পৌঁছন যাবে।

বাকলার দ্বিতীয় শিকারী এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে বসে আমাদের গল্প শুনছিল, কোন কথা বলেনি। এরা শহরের মানুষের কাছে সহজে মন খুলতে চায় না, পারেও না। ভিন্ন জাত, ভিন্ন গোষ্ঠী বা ভিন্ন সম্প্রদায় কিন্তু তার কারণ নয়। কারণ হয়তো আরও গভীরে, অন্য কোথাও—আমি সামান্য বুদ্ধি দিয়ে কি ধৃষ্টতা

প্রকাশ করবো! এত মিশেছি, খেয়েছি, থেকেছি তবু কাছে টানতে পারিনি, আপনজন হয়ে উঠিনি! কিন্তু দ্বিতীয় শিকারীরও বলার অনেক কথা ছিল, একটা ঘটনা শোনালো—সেদিন ছিল চাঁদনী রাত! এমন উজ্জ্বলা রাত কখন দেখিনি, গাছের মাথায় যেন আলোর ফুল ফুটেছে! ফুলের সেই পসরা নিয়ে নীরব নিস্তব্ধ বন, কোথাও এতটুকু চাঞ্চল্য নেই, যেন সামান্য একটু নড়েচড়ে উঠলেই সব ভেঙ্গে যাবে, ছিঁড়ে পড়বে। দূরাগত ঝিঁঝিঁর ডাক শুধু সেই নীরবতাকে ব্যাহত করছিল। হঠাৎ প্রস্রাব পাওয়ায় গভীর ঘুম থেকে উঠে সেই দৃশ্য দেখলাম। দিনের মত সেই আশ্চর্য উজ্জ্বলা আমার উঠোনে এসে থমকে রয়েছে। ঘরের দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে চারধারটা একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম, রাত-বিরাত···কিছু তো বলা যায় না!

হঠাৎ একটা কুঁই-কুঁই শব্দ কানে এল। শব্দটা এত অস্পষ্ট আর চাপা যে মনে হলো যেন কোন নিষ্পেষিত কণ্ঠ বিদীর্ণ করে দৈবাৎ শব্দটুকু হাওয়ায় ভেসে এল। ভয় হলো—নিশ্চয় খুব নিকটে কিছু একটা ঘটে চলেছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে চতুর্দিক খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ দেখতে পেলাম বেড়ার ধারে একটা কুকুর কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে রয়েছে। ব্যাপারটা কি জানবার জন্য গলাটা আরও একটু লম্বা করতেই কানে এল সেই কুঁই-কুঁই শব্দ, অত্যন্ত ভয়ে কাতর হয়ে যেন প্রাণভিক্ষা চাইছিল কুকুরটা। কিন্তু কার কাছে এই আকুতি দেখবার জন্য একটা পা বাড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই চোখে পড়লো মাত্র দশ বারো হাত দূরে একটা চিতাবাঘ ওৎ পেতে বসে রয়েছে।

দু'জনেই দু'জনের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়েছিল। কতক্ষণ তারা এভাবে ছিল জানি না। হঠাৎ লক্ষ্য পড়লো চিতাটার ল্যাজ তুলে উঠলো, তারপর ল্যাজটাকে মাটিতে আছড়াতে লাগলো। মাত্র দু'বার কি তিনবার আছড়েছে, তার পর কখন চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতেই ঝাঁপিয়ে পড়লো কুকুরটার ঘাড়ে। ক্যাঁই করে কেবল একটা ক্ষীণ শব্দ উঠলো, তার পর আর কিছু নেই, বিদ্যুৎগতিতে যে কোথায় চলে গেল দেখতে পেলাম না। চিতার চোখে সম্মোহনী শক্তি আছে কিনা জানি না, কুকুরটা কিন্তু পালাতে পারেনি। ঠায় বসে বসে কুঁই-কুঁই করে কেঁপে প্রাণভিক্ষা চেয়েছে, আর চিতাটা এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এসেছে। তারপর কি ঘটলো দেখার সাহস আর হয় নি দরজা বন্ধ করে দিলাম।

বাকলার শিকারী বললো—অনেক ঘটনা আছে বাবু, এক-আধদিনের

ব্যাপার তো নয়, প্রায় দু'মাসের ওপর অত্যাচার করছে। আর একদিন মোরগের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। এত রাত্রে মোরগ ডাকছে কেন? সে-রাতেও খুব উজ্জ্বলা ফুটেছিল। ঘরের বাইরে এসে মোরগটাকে খুঁজতে লাগলাম। কার মোরগের ঘরের খাঁচা খুলে গেছে কে জানে। কঁক্-কঁক্ ডাক ও ডানা ঝাপটানোর খস্ খস্ শব্দ হলো। শব্দটা খুব কাছেই হচ্ছিল। লাঠিটা নিয়ে উঠোনে নেমেই পড়লাম, হঠাৎ মোরগটা আর একবার ডেকে উঠতেই চোখ তুলে দেখি আমারই ঘরের চালে সাদা রঙের একটা মোরগ দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখেই চিনতে পারলাম সেটা আমার নয়, যারই হোক—আয় আয় বলে ডাকতেই মোরগটা ডানা ঝাপটিয়ে কঁক্-কঁক্ করতে করতে চালের ও-মাথায় গিয়ে বসলো।

মোরগটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চতুর্দিক দেখে নিচ্ছিল। এমন সময় চালের আর একপ্রান্তে অস্পষ্ট একটা খস্ খস্ শব্দ উঠলো। ভাবলাম সে ধারেও বুঝি আর একটা মোরগ রয়েছে। সামান্য একটু এগিয়ে উঁকি দিতেই একেবারে চোখাচোখি হয়ে গেল একটা চিতাবাঘের সঙ্গে, এ-ধারের গ'ড়ানে-চালে নখ বসিয়ে উপুড় হয়ে মোরগটার ওপর নজর রেখেছে। চোখাচোখি হতেই দাঁত-গুলো একবার বেরিয়ে এল, ল্যাজটা মোচড় দিয়ে উঠলো! এক মুহূর্ত আর দেরী না করে লাফ দিয়ে দাওয়ায় উঠেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলাম। চিতাটা খুব ক্ষুধার্ত না হলে সামান্য একটা মোরগ ধরবার জন্য চালে উঠতো না, হয়তো আমার ঘাড়েও লাফিয়ে পড়তো। খুব বেঁচে গেলুম সে যাত্রায়! ঘরের খিল্ বন্ধ করেও কাঁপুনি যায়নি, তারপর কি হলো জানি না। চিতাটা সে রাতে মোরগ ধরতে পারেনি তা অবশ্য পরের দিন সকালে জানতে পারা গিয়েছিল। কিন্তু চিতাটা কতক্ষণ চালের ওপর ছিল বা কখন নেমে গেল কান খাড়া রেখেও কিছু বুঝতে পারিনি।

আমার ঘরের চাল বেশ উঁচু, মাটি থেকে লাফিয়ে ওঠা শক্ত। একমাত্র রাস্তা পাশের রান্নাঘরের নিচু চাল বেয়ে ওঠা। তা, রান্নাঘরের চাল তো শুকনো তালপাতা দিয়ে ছাওয়া, সামান্য হাওয়া দিলেই খড়মড় শব্দ হয়। তবু চিতাটা বড় ঘরের চালে উঠেছিল ওই রান্নাঘরের তালপাতার চাল বেয়ে এবং শুকনো তালপাতার কোন শব্দ না করে। অবাক হবারই কথা, চিতাটা কি ভীষণ হুঁসিয়ার আর সাবধানী ভাবতেই যেন বুক শুকিয়ে যায়! পায়ের শব্দ হয় না, মাটিতে ছায়া পড়ে না, শূন্য থেকে যেন ভেসে ওঠে আবার সেই শূন্যেই যেন

মিলিয়ে যায়! গ্রামের মাতব্বররা বলে, চিতাটা কোন সাধারণ বাঘ নয়, নিশ্চয়ই জঙ্গলের কোন দুষ্ট আত্মা ওর ওপরে ভর করেছে।

আর একবার চিতাটা খুব অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিল। জলধরের ঘরের পাশে যে আম গাছটায় বসে আমরা পাহারা দিই, সেই গাছতলায় চিতাটা একদিন এসেছিল—তখন অনেক রাত। আমরা দু'জনে পাহারায় ছিলাম। আমি আর বুকুন। ঠায় বসে থেকে থেকে কেমন ঝিম্ ধরেছিল, ঠিক সেই সুযোগে সে এসে দাঁড়িয়েছিল গাছতলায়। কিছুই বুঝতে পারিনি এত নিঃশব্দে তার চলাফেরা, যখন চলে যাচ্ছিল দৈবাৎ দেখতে পেলাম গুঁড়ি-মেরে গ্রামের মধ্যে ঢুকছে। তখন কি আর করা যেতে পারে, হল্লা তুলে শুধু তাকে তাড়ানো যায়। ভাবলাম ফেরার পথে ওকে মারবো। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এল, ছুটন্ত অবস্থায় গাদা বন্দুকের গুলি না লাগতেও পারে, মতলব করে একটা মস্ত পাথরকে কোনরকমে টেনে টেনে গাছের ওপর তুললাম। চিতাটা ফেরার পথে যেই গাছতলায় আসবে অমনি মাথায় ভারী পাথরটা ফেলে দেব। এত উঁচু থেকে ভারী পাথরটা মাথায় পড়লে বাছাধনকে আর বাঁচতে হবে না।

অনেকক্ষণ কেটে গেল তবু চিতাটা এল না। ভাবলাম পাথর টেনে তোলার সময় হয়তো কোন শব্দ শুনে পালিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম কোন শব্দই সে শুনতে পায়নি, কোন শিকার সংগ্রহ করতে না পেরে ধীরে ধীরে গাছতলার দিকে এগিয়ে আসছিল। পাথরটাকে ধরে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলাম। দেখতে দেখতে সে এসে গেল। যেই গাছতলা পার হবে, অমনি ঠেলে দিলাম সেই ভারী পাথরটাকে। সবাই বলতো চিতাটার ওপর দুষ্ট আত্মা ভর করেছে, কথাটা কিন্তু ঠিক! দেখুন কি রকম শয়তান সে, পাথরটা পড়ার সময় মোটা ডালটার গায়ে সামান্য ঘষে গেল। সে তো হবেই, শব্দও কিছু শুনতে পেলাম না। অথচ শয়তানটা ঠিক শুনতে পেল, এত ওপরে গাছের ছালের সঙ্গে ঘষড়ানোর সেই ক্ষীণতম শব্দও তার কানে পৌঁছল। চকিতে মুখ তুলেই ঠিক স্প্রীংয়ের মত ছিটকে সরে গেল, তার পর আর তাকে দেখা গেল না।

ঠিক যে জায়গায় তার সামনের থাবার দাগ পড়েছিল, ভারী পাথরটা আছড়ে পড়লো ধপাস্ করে—মাত্র এক সেকেণ্ড পরে! চিতাটা লাফ দিতে যদি আর এক সেকেণ্ড দেরী করতো, তাহলে সে রাত্রেই তার দফারফা হয়ে যেত।

জিজ্ঞাসা করলাম, গ্রামে যে গাদা-বন্দুকটা রয়েছে তার ব্যবহার কর না কেন? শিকারী জবাব দিল, গাদা-বন্দুকে ওর মৃত্যু নেই। আমরা সাধারণত জঙ্গলে

বসেই বন্দুকে বারুদ ভরি, জালের-কাঠি ভরি, ক্যাপ্ লাগাই। সেদিনও তাই হলো, জঙ্গলে বসে বসে বারুদ ভরা হচ্ছিল, সন্ধ্যে হয়-হয় এমন সময় চিতাটা এসে পড়লো। জঙ্গলের একটা বাঁক ঘুরেই একেবারে মুখোমুখি, তখন কি আর করা যাবে, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে খালি নলটাকেই তার মুখের সামনে তুলে ধরা হলো।

আর একবার গাছের ডাল থেকে গুলি করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। ভরা-বন্দুক নিয়ে বুকুন একা গাছের ওপর বসেছিল আর আমরা ছিলাম আমলকী বনের কাঁটা-ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে। সে-রাতেও উজালা ফুটেছিল, ধব্-ধবে সাদা রাত! চারদিক নিঝুম নিস্তব্ধ, তখন অনেক রাত—চিতাটার এখনও দেখা নেই। আগে সন্ধ্যা রাতেই সে আসতো কিন্তু ইদানীং তাড়া খেয়ে খেয়ে খুব হুঁসিয়ার হয়ে উঠেছিল। তার আসারও কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না, গভীর রাত্রে নিঃসাড়ে কখন আসতো-যেতো কেউ জানতে পারতো না। বুকুনকে গাছে তুলে দিয়ে সেই যে বসেছিলাম একটুও আর নড়াচড়া করিনি। দেখতে দেখতে রাত গভীর হয়ে উঠলো, উজালার-আলোয় বন ঝকঝক করে উঠেছে। মনের মধ্যে যত ভয় তত ভাবনা নিয়ে মুখ গুঁজে বসে রয়েছি আমরা ক'জনে।

এমন সময় জঙ্গল থেকে একটা বুকফাটা আর্তনাদ ভেসে এল—'পড়ি গিলা, পড়ি গিলা, খসি গিলা'……! ঠিক মানুষের কণ্ঠস্বর, চমকে উঠলাম! তার পরে হঠাৎ মনে হলো, আমাদেরই শিকারীর কণ্ঠস্বর, হায়-হায় করে উঠলাম। নিশ্চয় শিকারীকে বাঘে ধরেছে, টেনে নামাচ্ছে গাছ থেকে, ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল। কেউ কেউ বললো, এমন উজালা-রাতে বুকুনকে একা যেতে দেওয়া ঠিক হয়নি। বুকুনের যে কি বিপদ ঘটেছে তখন আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি, অথচ তাকে সাহায্য করতে যে ছুটে যাব সে সাহসও ছিল না—কারণ আমাদের কাছে অন্য কোন অস্ত্র ছিল না, বন্দুকটা তো বুকুনের কাছেই রয়েছে। কি আর করবো, উৎকণ্ঠায় হায়-হায় করতে করতে দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ভয়ে কাঠ হয়ে বসে রইলাম।

আর কোন শব্দ বা চিৎকার কানে এল না। বুকুন বেঁচে নেই, তাকে যে বাঘে নিয়ে গেছে—এ হেন নিস্তব্ধতাই সে কথা প্রমাণ করে দিল। সাঁ-সাঁ করে রাত কেটে যেতে লাগলো, কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। বুকুনের আর্তনাদ যেন সব শব্দকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। এমন সময় শুকনো পাতার খড়-খড় শব্দ হলো। ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে দেখি কিছু নেই, হয়তো কোন বুনো জন্তু ঝোপ-

ঝাড়ের আড়াল থেকে দেখছে! এমন সময় লক্ষ্য পড়লো সেই আধো আলো আধো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে একজন মানুষ হেঁটে আসছে। ভয়ে বুকের রক্ত জল হয়ে গেল, মোহিনী—বলে সাধু তো চিৎকার করতে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি তার মুখ চেপে ধরলাম। তখন সর্বাঙ্গ কাঁপছিল, মানুষটা সামনে এসে দাঁড়াতেই চিনতে পারলাম—বুকুন! তার বাঁ হাতে বন্দুকের নল আর ডান হাতে কুঁদো -দেখে ভাবলুম বাঘটাই বুঝি আক্রমণ করতে গিয়ে বন্দুকটা ভেঙ্গে দু'টুকরো করে দিয়েছে!

অল্প একটু হেসে শিকারী বললো, আমরা যা ভেবেছিলাম তা নয়, বুকুন অন্য কথা বলেছিল। বন্দুকটা একপাশে রেখে সে চুপ করে গাছের ডালে লুকিয়ে বসেছিল। তখনও বাঘ আসেনি। রাত যত গভীর হতে লাগলো ততই তার ভয় করছিল, উজালা রাতে গাছের ডালে একা বসে থাকা ঠিক হয়নি। উঁচু গাছ থেকে সে দেখতে পেল ঝর্ণার ধারে মোহিনীর ওড়না উড়ছে, বাতাসে মোহিনীর বাঁশীর সুর ভেসে আসছে। বুকুন বলেছিল, তার কোন হুঁশ ছিল না, কেমন তন্ময় হয়ে সেদিকে চেয়ে ছিল। হঠাৎ খেয়াল হলো গাছের নীচে কি একটা এসেছে। চোখ নীচু করেই চমকে উঠলো, দেখলো বাঘটা গাছের গায়ে থাবা তুলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গাছ আঁচড়াচ্ছে। নখের খস্‌খস্‌ শব্দ তার কানে পৌঁছন মাত্র সে শিউরে উঠলো, বাঘটা বোধ হয় গাছে উঠে পড়বে।

ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে বন্দুকের কুঁদোটা শক্ত করে চেপে ধরলো, যাতে কোন শব্দ না হয়, নড়াচড়া বাঘটা যেন দেখতে না পায়! কুঁদোটা ধরে নলটা নীচে নামিয়ে দিয়ে নিশানা নিয়ে তবে গুলি করা যাবে। বাঘের চোখ ফাঁকি দিয়ে এতগুলো কাজ একসঙ্গে করা সোজা ব্যাপার নয়। ধীরে ধীরে নলটা নীচু করে পাকা নিশানা নিয়ে যেই গুলি করতে যাবে. অমনি লোহার ভারী নলটা খসে নীচে পড়ে গেল! ভীষণ চমকে বুকুন দেখলো তার হাতে শুধু কুঁদোটা! আর নলটাকে দু'থাবায় মাড়িয়ে বাঘটা গ্যাঁক্ করে কোথায় ছিটকে গেল—।

এ-হেন বিপদে পড়ে বুকুন সাহায্যের জন্য প্রাণপণে সঙ্গীদের ডাকতে লাগলো, 'পড়ি গিলা—পড়ি গিলা—খসি গেলা'······বাকলার শিকারী বললো, দেখলে বাবু—বন্দুকের গুলিতে বাঘটার মৃত্যু নেই! বন্দুকটা অবশ্য অনেক কালের পুরনো, বেশী করে বারুদ ভরার দরুন জোড়-মুখ থেকে কুঁদোটা ফেটে গিয়েছিল। একটা তার দিয়ে নলটাকে কুঁদোর সঙ্গে বেঁধে রাখা হতো! তা,

শয়তানটার তো বন্দুকের গুলিতে মৃত্যু নেই—তাই বন্দুক নীচু করতেই কিভাবে তার খুলে নলটা নীচে খসে গেল।—'নল খসি গিলা—আর কঁড় হব !'

অথচ দেখুন, এই বন্দুক দিয়েই একবার চিতাটাকে গুলি করা হয়েছিল। সেবার একটা ছাগল মুখে নিয়ে জঙ্গলে পালাচ্ছিল। সারারাত পাহারা দেবার পর যখন ভোর হয়ে আসছিল, ঠিক সেই সময় শিকারীর চোখে ঘুম নেমে এল। মরা ছাগলটা দাঁতে ঝুলিয়ে চিতাটা একেবারে সামনে এসে দৈবাৎ একটা শুকনো ডালের পাতা মড় মড় করে গুঁড়ো করে দিতেই শিকারী চোখ খুলে দেখে সামনে বাঘ ! অমনি বন্দুক তুলেই গুলি করে দিল গুড়ুম করে। এত অকস্মাৎ ঘটনাটা ঘটে গেল যে শিকারী নিশানা নেওয়ারও সময় পেল না, গুলিটা সামান্য নীচু হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গীরা চিৎকার করে উঠেছিল, পাড়ি গিলা—পাড় গিলা, কিন্তু দেখা গেল চিতাটা পড়েনি, তার দাঁত থেকে মড়িটা খসে পড়েছিল।

বাকুলার শিকারী অনুযোগ করলো—আপনাদের মত টোটার-বন্দুক তো আমাদের নেই, এক-নলা গাদা বন্দুকে মাত্র একবারই বারুদ ভরা যায়। সেই এক গুলিতে যা হবার তাই হয়, দ্বিতীয়বার বারুদ ভরে গুলি করতে অনেক সময় লাগে—বাঘ তো আর ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে না, অনেক অসুবিধা আমাদের বাবু !

বাকুলার দ্বিতীয় শিকারী জিজ্ঞাসা করলো, জংলী কুত্তা দেখেছেন বাবু ? হঠাৎ খেয়াল হলো সত্যিই তো, এতদিন জঙ্গলে ঘুরছি জংলী কুকুর তো কখন দেখিনি ! শুনেছিলাম জংলী কুকুরদের মধ্যপ্রদেশে 'সোনা' বলা হয়, ভয়ানক জেদী জানোয়ার। ঘাসের ডগা দাঁতে চেপে শিস্ দিলে যে সরু শব্দ হয়, জংলী কুকুরের ডাক নাকি সেই রকম। দলবদ্ধ হয়ে বিচরণ করে বা শিকার ধরে। ছুটন্ত হরিণ-সম্বরকে পিছন থেকে আক্রমণ করে মাংস ছিঁড়ে-ছিঁড়ে হত্যা করে। প্রকৃতির রাজ্যে জংলী-কুত্তা এক অভিশাপ !

বাকুলার শিকারী বললো, আমাদের জঙ্গলে একবার জংলী কুত্তা এসেছিল। টুকান সে-রাত্রে টঙে বসে ফসল পাহারা দিচ্ছিল। তখন শীতকাল, একটা মাটির গামলায় কাঠ-কয়লার আগুন করে তার ধারে বসেছিল। তখন অনেক রাত, হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছিল। এমন সময় কিসের একটা শব্দ শুনে নীচে তাকিয়ে দেখে পাঁচ-ছটা কালো কালো ছায়া টঙের নীচে মুখ তুলে এক রকম অদ্ভুত শব্দ করছে। ভয়ে টুকানের বুক শুকিয়ে গেল, বেচারা একা—তার ওপরে এত রাত, ডাকলেও কারুর সাড়া পাওয়া যাবে না ! হঠাৎ মনে পড়লো আগুনকে সব

প্রাণীই ভয় পায়, সঙ্গে সঙ্গে করলো কি—সেই জ্বলন্ত কাঠ-কয়লার আগুন গামলা উপুড় করে জন্তুগুলোর ওপর ঢেলে দিল। তার পর চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে জন্তুগুলো পালিয়ে গেছে।

জন্তুগুলো কেন তার টঙের নীচে এসেছিল, তার কারণ জানতে পারা গেল আরও মিনিট পাঁচ-সাত পরে। টুকান একইভাবে নীচের দিকে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ দেখতে পেল তার টঙের নীচের দো-ডালায় আরও একটা জন্তু বসে ছিল। জংলী কুকুরগুলো অদৃশ্য হওয়ার পাঁচ-সাত মিনিট পরে সে-ও গুঁড়ি মেরে নীচে লাফিয়ে পড়লো। মাটিতে পড়তেই টুকান দেখতে পেল সেটা সেই চিতাবাঘটা! মাত্র তিনহাত নীচে বসেছিল সেই ভয়ঙ্কর চিতাবাঘ, যার ভয়ে সমস্ত গ্রাম তটস্থ হয়ে আছে।

চিতাটার অনেক ঘটনা শুনিয়ে বাক্‌লার শিকারীরা সেদিন বিদায় নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—হাঁকোয়ার তোড়জোড় হচ্ছে, দিন স্থির হলেই আমায় খবর পাঠাবে। ঘটনাগুলো শুনেও আমার বিশেষ কোন উপকার হলো না, চিতাটাকে কোন কৌশলেই বাগে আনতে পারলাম না। সে যেমন বহাল-তবিয়তে ছিল তেমনিই রইলো।

একদিন পশ্চিমের সেই জঙ্গল যেখানে মোহিনীর খপ্পরে পড়েছিলাম, সেই বনে চিতাটার সন্ধানে রওনা দিলাম। জলাভূমিটা পার হয়ে গভীর বনে প্রবেশ করতেই একটা শুকনো নালা চোখে পড়লো। হলধরের সঙ্গে যখন এসেছিলাম, তখন কিন্তু নালা দেখিনি, সম্ভবত সেটা অন্য পথ। পার হবার জন্য নালার মধ্যে নামতেই নরম বালিতে চিতার পায়ের স্পষ্ট ছাপ ফুটে রয়েছে দেখতে পেলাম। ছাপটা টাটকা—বোধ হয় ভোরবেলার। চূড়ামণিকে ইসারায় জানিয়ে দিলাম চিতাটা কাছাকাছি কোথাও থাকতে পারে। নালাটা পার হয়ে পায়ের ছাপ ঘাস-বনের ওপর দিয়ে ভিতরের দিকে কোথায় চলে গেছে। সেই চিহ্ন ধরে যাওয়ার কোন উপায় নেই, কেননা ঘাস-বনে চিতার পায়ের ছাপ হারিয়ে গেছে। এখন অনুমানের ওপর নির্ভর করে যাওয়া ছাড়া গতি নেই, ফলে আমাদের অগ্রগতি স্বাভাবিক কারণেই মন্থর হয়ে পড়লো। গভীর জঙ্গলে সে যেখানে খুশী হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকতে পারে। হয়তো সে খুব কাছেই কোথাও রয়েছে, নয়তো অনেক দূরের কোন গুঁড়ির আড়ালে অথবা মাটির ফাটলে দিনটা সুখনিদ্রায় অতিবাহিত করছে।

আমাদের সম্মুখে তখন রৌদ্রদগ্ধ এক ঘন জঙ্গল, ক্রমশ গভীর হয়ে পাহাড়ের

মাথা ছেয়ে রয়েছে। নিস্তব্ধ দুপুর খাঁ-খাঁ করছিল, কোথাও এতটুকু সাড়াশব্দ নেই, বনের আওতায় স্যাঁৎস্যাঁতে মাটি থেকে গরম বাষ্প উঠছিল। সেই প্রখর রৌদ্রে পাখীরা গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। সেই কাঠফাটা রৌদ্র মাথায় নিয়ে চিতাটার তল্লাসে ঠিক আসি নি, খবর ছিল চিতা একটা মড়ি করেছে। সেই মড়ির সন্ধানে নালা পার হয়ে গর্ভের বনে এসে পড়লাম। তারপর সেই মোটা শাল গাছটার খোঁজ করতে গিয়ে যেই ঝোপের আড়াল থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি, অমনি একটা কোট্‌রা তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলো! শব্দটা এমনই আচম্বিতে হয়েছিল যে দেহের রোমকূপ যেন মুহূর্তে খাড়া হয়ে উঠলো! যে ঝোপটার আড়ালে তখন দাঁড়িয়েছিলাম একেবারে স্থির হয়ে গেলাম সেখানে। লক্ষ্য করলাম, জঙ্গলের কোথাও নড়েচড়ে উঠলো না, রাইফেলটা দু'হাতে ধরে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করলাম কিছুক্ষণ, কিন্তু কোট্‌রাটা আর ডাকলো না। সে কোথা থেকে ডেকে উঠলো, কেন ডাকলো, আর কোন দিকেই বা চলে গেল তাও বুঝতে পারলাম না।

কোট্‌রার ডাকের দুটো কারণ থাকতে পারে—হয় চিতাটা তার নজরে পড়েছে, আর না-হয় ভয় পাবার মত এমন কিছুর সামনে দৈবাৎ গিয়ে পড়েছে। তাছাড়া আমাদের হঠাৎ দেখতে পেলেও ডেকে উঠতে পারে। কিন্তু মাত্র একবার ডেকেই থেমে যাওয়ার কারণ—না আমরা, না চিতা—বলেই ধারণা হলো। তবে ভাবনা হলো—এই ডাক শুনে চিতাটা কোথা থেকে হঠাৎ না উঠে আসে!

রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল রেখে ঝোপের তলা দিয়ে যতদূর দেখা যায় বার বার দেখে নিলাম, প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিট কেটে গেল। ঘামে তখন সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে, ঠোঁটের কোণে নোনা স্বাদ আবার চোখের কোণ দিয়ে সেই নোনা ঘাম প্রবেশ করে চোখ জ্বালা করতে লাগলো। জামার হাতায় চোখ মুছে আবার ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলাম। বনের একটা সুঁড়ি পথের দু-পাশের ছোট-ছোট ঝোপের কিছু মোচড়ানো ডালপালা নজরে আসতেই চূড়ামণিকে ইসারা করলাম। সে পরীক্ষা করে বললো, গত রাত্রের ঘটনা। একটা পাতায় ছোট্ট এক বিন্দু শুকনো রক্ত লেগে রয়েছে। সেই মোচড়ানো ডালপালা, ভাঙ্গা ঘাস, ছেঁড়া পাতা লক্ষ্য করে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ গজ যাবার পর মোটা শালগাছটা নজরে এল। বাজ পড়ে গাছটা অনেকদিন আগেই শুকিয়ে গিয়েছিল, তার পরে ঝড়ে যত ডাল ভেঙ্গেছে—তার চেয়েও বেশী ভেঙ্গে নিয়ে গেছে গ্রামের কাঠ-কুড়োনীরা। বর্তমানে শুধু গুঁড়িটা হাত ছয়-সাত উঁচু হয়ে রয়েছে।

সেই গুঁড়ির গোড়ায় কালো মতন কি একটা পদার্থের ওপর হঠাৎ দৃষ্টি আটকে গেল। সেটা কি—এতদূর থেকে ভালো বোঝা গেল না—এক খণ্ড পচা কাঠও হতে পারে, আবার কালো রঙের কোন পাথর হওয়াও বিচিত্র নয় বনের এ-দিকটায় ছোট ঝোপ অপেক্ষা বড় গাছই বেশী। যাই হোক সেই কালো মতন জিনিসটা লক্ষ্যে রেখে আবার গুঁড়ি মারতে লাগলাম। হঠাৎ ঘুমন্ত চিতার সামনে যদি পড়ে যাই তো একেবারে হাতাহাতি লড়াই বেধে যাবে।

কালো মতন জিনিসটার কাছে আসতেই উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম, যাক মড়িটা তাহলে পাওয়া গেল! মড়ির তিন-ভাগই খাওয়া হয়ে গেছে, খুব সামান্যই পড়েছিল, তবু তো একটা মড়ি পেলাম! মড়িটা কোন গৃহপালিত জন্তুর নয়, একটা বুনো শুয়োরের। কাঠ-কুড়োনিরা সকালে এসে দেখে গিয়েছিল।

মাচা বাঁধার কোন সরঞ্জাম সঙ্গে ছিল না, প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরের একটা গাছে উঠে পড়লাম। মড়িটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল, ঘন পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসবার পক্ষে গাছটা চমৎকার। দু-জনেই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে তবু একটু বসা গেল। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম কোটরাটা কেন ডেকেছিল, বাঘের মড়ি দেখেই বোধ হয় আঁৎকে উঠেছিল।

ক্রমশই বেলা পড়ে আসতে লাগলো, গাছের লম্বা লম্বা ছায়া মিলিয়ে যেতে লাগলো। আর নড়াচড়া নয়, এবার যতদূর সম্ভব স্থির হয়ে আত্মগোপন করে থাকতে হবে। তবু ঘন পাতার আড়ালে জড়সড় হয়ে রয়েছি, হঠাৎ কোথা থেকে একটা পাখী এসে তার ডালে বসতে-না-বসতেই ভয়ানক চেঁচামেচি করে উড়ে পালালো—ওরে ব্বাবা! এ আবার কে! তার সেই ডাক শুনে ধূসর রঙের একটা বড় 'মথ্' গাছের গুঁড়িতে একেবারে সেঁটে হয়ে গেল। আর-একটা বেজি নিঝুম ঝোপের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ মাথা তুলে গাছটাকে লক্ষ্য করে গেল। কেঁদ-গাছ থেকে সেই সময় একটা শুকনো পোকা-ধরা কেঁদ-ফল বোঁটা খসে ধপ্ করে নীচে পড়তেই পাটকিলে রঙের একটা পতঙ্গ এসে তার ওপর চেপে বসলো। আমার সামনে মাত্র হাত-খানেক দূরে যে ডালটা রয়েছে, তার একটা ছোট্ট ফোকরে একটা শতপদী মুখ বাড়িয়েছিল—হঠাৎ কখন অদৃশ্য হয়ে গেল।

পূর্বেই বলেছি—বনের সহস্র চোখ সহস্র কান, আমি যাব কোথায়! লুকিয়ে থাকবার যো আছে না কি! ড্যাব্-ড্যাবে চোখে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে একটা গিরগিট। উত্তেজনায় তার ঘাড় পর্যন্ত সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে উঠেছে চোখের পলক নেই, দেহেও কোন সাড় নেই, প্রসারিত দু'হাতের ওপর ভর রেখে

মুখ তুলে রয়েছে যেন একটা শুকনো 'কাটুম্‌-কুটম্‌'! এমনি কঠিন স্থির হয়ে অপলক দৃষ্টিতে আমার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান তির্যক ভঙ্গিমায় লক্ষ্য করতে করতে দেহের অর্ধেকটা কখন সবুজ হয়ে গেল, আর বাকি অর্ধেকটা গাছের শুকনো ছালের রঙে রূপান্তরিত হয়ে চক্ষের নিমেষে মিলিয়ে গেল! পাতার আড়ালে একটা কালো বুল্‌বুলি উত্তেজনায় দু-ঠোঁট ফাঁক করে ঝিমুচ্ছিল, যেন কিছুই তার নজরে পড়েনি! সিরীষ গাছের ডালে হাঁ-করা তিলে-বাজ আমাকে না দেখার ভান করে উদাসীনের মত মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। গুব্‌রে পোকাটা কেন অকারণে বোঁ-ও করে এক চক্কর দিয়ে গেল জানি না। ল্যাণ্টানা ফুলের থোকায় চন্দনের হাল্কা টিপ, ঘাড় বেঁকিয়ে সেও যেন জানিয়ে দিল—মুই দেখিচু! আর একজন তো রীতিমত সোরগোল তুলে পাড়া-পড়শীকে আমার অনধিকার প্রবেশের কথা সরবে ঘোষণা করে দিল। গাছের ডাল বেয়ে তর্‌-তর্‌ করে ছট্‌ফটিয়ে মাটিতে নেমে তীরবেগে ছুটে গেল মড়ির ঠিক পাশের গাছটা লক্ষ্য করে। এইটুকু যেতে কতই না অঙ্গভঙ্গি করলো, কতবার গাল ফুলিয়ে ল্যাজ দুলিয়ে ডেকে উঠলো—তারপর গুঁড়ির অর্ধেকটা উঠে মোটা রোমশ ল্যাজ নেড়ে হেঁটমুণ্ডে দারুণ উত্তেজনায় ডেকে উঠলো, কিট্‌-কিট্‌......।

কোথাও এতটুকু বাতাস ছিল না। ঝোপঝাড়ের ফাঁকে মাকড়সার জাল পাতা, নিস্পন্দ উন্মুখ সেই রৌদ্রদগ্ধ নিস্তেজ পাতার আড়ালে কারা যেন কান পেতে রয়েছে! এতটুকু ইসারা, এতটুকু সাড়ার ওয়াস্তা, মুহূর্তে রটিয়ে দেবে ঝোপেঝাড়ে, গুল্মে-লতায়, বনের সুঁড়িপথের অলিতে-গলিতে সেই দারুণ সংবাদ! কেউ লক্ষ্য করছে, এমন অবস্থায় নির্লিপ্ত হয়ে অচঞ্চল বসে থাকা খুব শক্ত, দারুণ এক অস্বস্তিতে নির্ঘাৎ ভুগতে হয় যতক্ষণ না অবস্থার আশু কোন পরিবর্তন ঘটে। সেই অস্বস্তিকর পরিবেশে আমার সময় কাটতে লাগলো ঘড়ির কাঁটা ধরে, যার ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। দুপুর গড়িয়ে বিকাল হলো। বেলা-শেষের পড়ন্ত রোদ্দুর গাছের শীর্ষডালে ঝল্‌মলিয়ে উঠলো, পাখীদের ডাক আবার শোনা যেতে লাগলো। ঝিঁঝিঁপোকা ডাকছে, থামছে—আবার ডেকে চলেছে ক্রমাগত। শোনা ছিল—ঝিঁঝিঁপোকা পনেরো সেকেণ্ডে যতবার ডাকে তার সঙ্গে সাঁয়ত্রিশ যোগ করলে সেই স্থানের তাপমাত্রা বোঝা যায়। চূড়ামণি হঠাৎ কিছু শুনে থাকবে, নিশ্চিত হবার জন্য কান খাড়া করেছিল—পরে মাথা নাড়িয়ে দিল—না, কিছু নয়! জঙ্গলে সামান্য একটা কাঠি ভাঙ্গার শব্দও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

বনের ছায়া ক্রমে গাঢ় হয়ে এল, মড়ির খুব সামান্যই পড়েছিল—জানি না

চিতাটা আসবে কি না! তবু কপাল ঠুকে বসে রইলাম, মড়ির ওপর বসার সুযোগ এই প্রথম। সুতরাং আমার ওপর কি প্রতিক্রিয়া চলছিল তা বলা নিষ্প্রয়োজন। গুলিভরা রাইফেলটা পাশেই রেখে দিয়েছিলাম, এতদিন সুযোগ আসেনি, জানি না আজও তেমনি নীরব থাকবে কি না!

পাখীর ডাক আর শোনা গেল না, ধূসর অন্ধকার নেমে আসছিল। বন-মোরগের ভাঙ্গা ডাক শুনে অনেক দূর থেকে অন্য একটা গর্বিত মোরগ অবজ্ঞার সুরে ডেকে উঠলো। মোরগরা একে অন্যের প্রাধান্য স্বীকার করতে চায় না। এ যদি বলে উজ্জ্বল দিনটি বেশ, তার জবাবে ও বলবে উজ্জ্বল দিনটির সূচনা আমিই করেছি—ঘাড়ের লোম ফুলিয়ে সূর্যোদয়ের প্রথম আলোকে আমিই স্বাগত জানিয়েছিলাম প্রথম! অহংকারের লড়াই ওদের চিরকালের। এমন সময় একটা কালো পাখী তার লম্বা ল্যাজ দু'দিকে বাঁকানো, মড়িটার কাছে এসে বসলো। চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলো তার কোন শত্রু কাছে-পিঠে রয়েছে কি না, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে ঠুকরে ঠুকরে মাংস খেতে লাগলো। চতুর্দিক নিঝুম অন্ধকারে ছেয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে মাংস খেয়ে গেল।

এমন নীরব নিস্তব্ধ ঘন বনে আশা করেছিলাম চিতাটা হয়তো তাড়াতাড়ি আসবে, কিন্তু সে এল না। এমন সময় ময়ূর ডেকে উঠলো। সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে যে কোন মুহূর্তের অপেক্ষায় তৈরী ছিলাম, হঠাৎ মাথার ওপর দিয়ে সোঁ-সোঁ করে উড়ে গেল ময়ূরটা। ঘুটঘুটে অন্ধকারে আর মড়ি দেখা যাচ্ছিল না। চোখের কাজ এতক্ষণে ফুরলো, যে কানের ওপর নির্ভর করবো যান্ত্রিক সভ্যতার গুণে তারও অত্যন্ত কাহিল অবস্থা। তখনও চাঁদ ওঠেনি। নালার ধারে কি একটা রাতের পাখী পোকা ধরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে শুকনো পাতার খড়খড় শব্দ করছিল আর মধ্যে মধ্যে ডেকে উঠছিল চিক্-চিক্ করে। কি কারণে তার ডাক হঠাৎ বন্ধ হলো জানি না।

সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে হঠাৎ অনেক দূর থেকে চিতল-হরিণের ডাক ভেসে এল, তারপর আর কিছু নেই। এমন সময় খুব কাছ থেকে অস্পষ্ট একটা খস্‌খস্ শব্দ শ্রুতিগোচর হলো, তারপর আবার সেই মৃত্যুর স্তব্ধতা। শব্দগুলো যেন গভীর ইঙ্গিতপূর্ণ। অথচ আমার চোখের সামনে তখন শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার—অনুভবে এক অজানা শিহরণ! নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কে যেন সেই অন্ধকারে মিশে রয়েছে, মাটির বুকে যার কোন স্পন্দন নেই! নৈশ স্তব্ধতা উন্মুখ হয়ে রয়েছে, এখুনি হয়তো কিছু ঘটে যেতে পারে!

নিরবিচ্ছিন্ন অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম, খস্‌খস্‌ শব্দটা এতক্ষণ পরে যেন আবার শ্রুতিগোচর হলো। কান পেতেও সেই শব্দের উৎপত্তিস্থল কোথায় নির্ণয় করতে অক্ষম হলাম। এক একটা সময় আসে যখন উদ্বিগ্ন মন নিজেকে সংযত নিরপেক্ষ রাখতে পারে না, কখন চোখের সঙ্গে, কখন বা কানের সঙ্গে পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। আকাঙ্খিত বস্তুকে কাল্পনিক অবয়ব দিয়ে চোখকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে—দেখ, এই তো তুমি দেখতে চেয়েছিলে! আবার কানে 'বোল্‌' হয়ে বেজে উঠে মুগ্ধ শ্রবণেন্দ্রিয়কে প্রতারিত করে! খস্‌ খস্‌ শব্দটা কোথায় হলো, মনে-না-বনে! এমনি কোন চেনা শব্দ শোনার জন্যই হয়তো কান তখন উৎকর্ণ হয়েছিল। উতলা মনে কেবলই সংশয়—সে কি আসবে না, কেন এখনও এল না!

এমন সময় খ্যাঁক করে একটা শব্দ উঠে সেই নৈশ স্তব্ধতাকে যেন চমকে দিল! মড়িটা যেখানে পড়েছিল, ঠিক সেইখান থেকে এল শব্দটা। সন্দেহ হলো, তবু চূড়ামণিকে ইসারা করলাম আলো ফেলবার জন্য। পাঁচ-সেলের টর্চ জ্বলে উঠতেই দেখলাম, দুটো শিয়াল মড়ির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সবুজ চোখগুলো একবার জ্বলে উঠেই বনের আড়ালে চকিতে মিলিয়ে গেল, টর্চ নিভিয়ে দিল চূড়ামণি। এরপর যাঁরা বলবেন. আর মাচায় বসে থাকা কেন? তাঁদের অবগতির জন্য বলি—বাঘ যদি সেই সময় মড়ির পাশে থাকতো বা খাওয়া শুরু করতো, তাহলে প্রশ্ন করাটা সার্থক হতো। আর যদি তা না থাকতো অর্থাৎ তখনও মড়িতে আসেনি বা আসবার জন্য হাঁটা দিয়েছে, তাহলে অনায়াসে ভেবে নিত বনে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বড় জোর একটু থমকে যেত, একটু বেশী সতর্ক হতো—এই পর্যন্ত। গোটা বনটাকে হয়তো বার'কতক চক্কর দিত। রাত নটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর নেমে এলাম। শিয়াল দুটো এবার এসে নিশ্চিন্তমনে ভোজে বসবে, খাওয়া নিয়ে যতই ঝগড়া করুক—বনে আর বিদ্যুৎ চমকাবে না।

নালাটা পার হয়ে জলাভূমির ধারে এসে পৌঁছলাম। গতবার এখানে ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না ফুটেছিল, আর আজ কি ভয়ানক ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার! হঠাৎ জলার মাঝখান থেকে একটা বাইসন সুর করে ডেকে উঠলো, গাঁ-আ-আ! সঙ্গিনীকে আহ্বানের ডাক। হঠাৎ মনে পড়লো, গতবারেও এমনি বাইসন দেখেছিলাম, তার পরের কাহিনী তো শুনেছেন—আজও কি আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে! বাইসনের ডাক আর শুনতে পেলাম না। চূড়ামণি পথ ভুল করেনি, পাক্‌দণ্ডির প্রায় কাছাকাছি এসে পড়লাম।

এমন সময় সেই বাঁশীর সুর হঠাৎ ভেসে এল। ঘুটঘুটে অন্ধকারে গভীর বন থেকে ভেসে আসা সেই ভূতুড়ে সুর শুনে গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠলো। আমি আশা করলাম চূড়ামণি কিছু বলবে, কিন্তু সে নীরব থাকায় আর উচ্চবাচ্য করলাম না। নীরবে তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। বাঁশীর সুর পিছনের গাঢ় অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল। হলধর বলেছিল—এ বাঁশী সবাই না-কি শুনতে পায় না……!

বাংলোয় ফিরে এসেও সুস্থির হতে পারলাম না, বাঁশীর সুর যেন কানে লেগে রয়েছে। বাঁশীর সুরে জাদু আছে, সেই জাদুতে সাপ মুগ্ধ হয় শুনেছি। জানি না, কোন্ মোহিনী শক্তি সেই সুরে এসে ভর করে! নির্জন বনে, এত রাত্রে কে বাঁশী বাজাতে পারে—ভেবে বিস্ময়ের আর অবধি রইলো না! সেই ভয়ংকর আরণ্যক পরিবেশে মোহিনী যেন ক্রমে বাস্তব হয়ে উঠলো। মনে হলো—এই বিশাল বন-পাহাড়ের গোপন রহস্য লোকচক্ষুর অন্তরালে যে বৈচিত্র্যের সমারোহ ঘটায় ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে তার নাগাল কেমন করে পাবো! উজ্জ্বলা রাতের বৈভব যেমন ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তেমনি নিকষ কালো অন্ধকারের রূপ—ক্ষণে ক্ষণে যা চমক্ সৃষ্টি করে, অনুভূতিকে শিহরণে কাঁপায়। যা বুদ্ধির অগম্য—সে কি শুধু অবাস্তব, কল্পনাপ্রসূত মাত্র……!

তার পরের দিনও হাঁকোয়ার খবর এল না। জলাভূমিটা পার হয়ে সেই নালার ধারে আবার এলাম। গতদিনের মত নালা অতিক্রম করে বনে প্রবেশ না করে নালা বরাবর দক্ষিণ মুখো হয়ে হাঁটতে লাগলাম। নালাটা জলার দক্ষিণ কোণে এসে শেষ হয়েছে। চূড়ামণি একটা গাছ দেখিয়ে বললো—এই গাছে বসলে বনের অনেকটা দেখা যাবে, তাছাড়া চিতার চলাচলের একটা মোক্ষম রাস্তা। অতএব উঠে বসলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে সূর্য গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হতেই ধূসর সন্ধ্যা নেমে এল। পাখায় সাঁ-সাঁ শব্দ করে পাখীরা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। রোদে-পোড়া জলার বুক থেকে গরম বাষ্প উঠছিল। পোকা-মাকড়রা সবে সরব হতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় বনের পিছন দিক থেকে কোটরার চাঞ্চল্যকর সঙ্কেত ভেসে এল। স্তব্ধ অরণ্য চমকে উঠলো, ছেদ পড়লো ঝিঁঝিঁপোকাদের ডাকে, জলার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে ডানা ঝাপটিয়ে বাদুড় উড়ে গেল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে এখন সবে রাত্রি শুরু হয়েছে, তারার অস্পষ্ট আলোয় দৃষ্টি কেবলই হোঁচট খেতে লাগলো। কখন একটা মাটির ঢিবি, কখন গাছের কাটা-

গুঁড়ি, কখন বা ঝোপের ফাঁকে জেগে থাকা এক-খণ্ড পাথরের কিছু অংশ—এমন আশ্চর্য অবয়ব ধারণ করে দৃষ্টির স্বচ্ছতাকে বিভ্রম ঘটাতে শুরু করলো যে, কহতব্য নয়। ক্ষণে ক্ষণে রাইফেলটাকে শক্ত-হাতে চেপে ধরতে হলো, চিবুকের পেশী দৃঢ় হয়ে উঠলো। চোখের মাথা-খাওয়া উৎকণ্ঠার সেই মুমূর্ষু মুহূর্তগুলো গভীর সন্দেহে ও সংশয়ে দোলায়িত হতে হতে পরিবেশকে অসহ্য করে তুললো। বারে বারে সচকিত হয়ে ওঠা, আবার হতাশায়-অবসাদে ঝিমিয়ে পড়ার হাত থেকে কোন রেহাই নেই। বিতৃষ্ণায় যখন মন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ঠিক তখনই হয়তো কোথা থেকে ভেসে আসে খুট্ করে একটি শব্দ, যা বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মতই চমকে দেয়। মুহূর্তে শিরায় শিরায় উন্মাদনার তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়ে যায়। রাইফেলের ট্রিগারে শক্ত হয়ে বসে যায় হাতের আঙ্গুল, ধীর-স্থির অচঞ্চল দৃষ্টি তখন ইঞ্চি ইঞ্চি করে বন ফালা ফালা করে দেখে, শ্রবণেন্দ্রিয় প্রখর হয়ে ওঠে মাটির স্পন্দনে। যন্ত্রণায় এহেন মুহূর্ত গুনতে গুনতে সময় কেটে গেল। রাত যত গভীর হলো, ততই শান্ত স্তব্ধ হয়ে এল বন। অকস্মাৎ বন-বাদাড় ভেঙ্গে ছোটাছুটির উত্তেজনা রজনীর প্রথম প্রহরেই সাঙ্গ হয়েছে। এখন ঢিমে তেতালায় চলেছে ডুল্‌কি চালে। কে এল, আর কে গেল উদাসীন অরণ্যের যেন কোন ভ্রূক্ষেপ নেই!

একটা বরা চলে গেল জলার বুনো কচু তুলতে। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই, একটা কোট্‌রা চরে বেড়াচ্ছিল জলার এ-প্রান্তে, বরাটাকে দেখে ঘুরে দাঁড়ালো। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম কোট্‌রাটা পিছনের বনে ঘাড় বেঁকিয়ে কি দেখছে কান দুটোকে খাড়া করে। পাথরের মত স্থির হয়ে রইলো কতক্ষণ সেই একই-ভাবে, তার পরে তীরবেগে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে গেল জলার ধার দিয়ে পশ্চিমের বন লক্ষ্য করে। কোট্‌রাটার মত আমিও পিছন ফিরে দেখতে গেলাম—কি দেখে সে পালালো। যেই ঘাড় ফিরিয়েছি অমনি চিতার একটা অস্পষ্ট গোঙানি শুনতে পেলুম। অন্ধকার বনে কিছুই ঠাওর করতে পারলাম না। তার পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল।

নীরব নিস্তব্ধ বন, কোথাও প্রাণের কোন সাড়া নেই। সেই গাঢ় অন্ধকারের বুকে হঠাৎ আলোর একটা আভা এসে পড়লো, মুখ তুলে দেখলাম গাছপালার আড়াল থেকে চাঁদ উঠছে।

ফিরে এলাম বাংলোয়। জলাভূমি অতিক্রম করে পাকৃদণ্ডির কাছে আসতেই শুনতে পেলাম সেই সুর। চূড়ামণিকে ফিস্ ফিস্ করে বললাম, এ-

দিকটা একটু দেখবো। অমনি সুর থেমে গেল! এবারও চূড়ামণি বাঁশীর কথা কিছু বললো না দেখে আমিও চুপ করে ছিলাম। কিছুদূর যেতেই বনের মধ্যে ছোট্ট একফালি ক্ষেত নজরে এল, ক্ষেতের মাঝখানে একটা বেঁটে গাছের ওপর একটা টঙ বাঁধা।

টঙটা কার জানবার জন্য যেই চূড়ামণির দিকে ফিরেছি, অমনি সে ভয়ার্ত শব্দ করে লাফিয়ে উঠল। ভীষণ চমকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হলো? সেই মুহূর্তেই শুকনো পাতার ওপর সর্-সর্ শব্দ হলো, কোন কিছু তার ওপর দিয়ে দ্রুতবেগে চলে যচ্ছিল। তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বেলে দেখি—একটা মস্ত সাপ জলার দিকে নেমে যাচ্ছে। কি সাপ বুঝতে পারলাম না, ততক্ষণে সে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তবে সাপটা মস্ত বড় আর বেশ মোটা। টঙটার কাছে আর যাওয়া হলো না। জঙ্গলে এ ধরনের টঙ আমি অনেক দেখেছি ও রাত কাটিয়েছি। টঙটা দেখে লোভ হয়েছিল। সেখানে এসে একরাত বসবো—কিন্তু সাপটার ভয়ে তাড়াতাড়ি পাকদণ্ডি বেয়ে নীচে নেমে এলাম। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে-ছিলাম, ক্ষেতের ধারে দাঁড়িয়ে চূড়ামণি আমার দিকে কেমন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ বাঁশী থেমে যাওয়া ও তার এভাবে তাকানোর মধ্যে কিছু ছিল কিনা জানি না। বাংলোয় উঠতে উঠতে শুধু মনে হলো—সেই অভিশপ্ত সুর চূড়ামণির কানে কি পৌঁছয়নি! না—না-শোনার ভান করছিল?

রাতের জঙ্গলে যারা পায়ে হেঁটে বেড়ায়, তাদের অনেক সময় এমন কিছু অসম্ভব অবাস্তব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। আমিও তখন মনে মনে কিছু অসম্ভব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে খুঁজতে হাঁটছিলাম। অনেক ক্ষেত্রে কোন জবাবই ঠিক মনের মত হয় না, কোথায় যে একটা ফাঁক থেকে যায় বুদ্ধি দিয়ে যা পূরণ হয় না। তখন মনে হয়—যা আমাদের বোধগম্যের বাইরে, যুক্তিতর্ক যেখানে হার মানে, বুঝবুদ্ধি থৈ পায় না—এমন সব ক্ষেত্রে অলৌকিক ও ভৌতিকের ঘাড়েই তো সব দায়ভাগ চাপিয়ে দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চাই।

পরের দিন দুপুরবেলা একাএকাই বেরিয়ে পড়লাম, পথঘাট বেশ সড়গড় হয়ে গেছে। পাকদণ্ডি বেয়ে ওপরে উঠেই থমকে দাঁড়ালাম, বনের দিকে না গিয়ে সেই টঙটাকেই আগে দেখবো। ক্ষেতটা চোখে পড়তেই ঝোপের পাশ থেকে দেখতে পেলাম একটা বছর চব্বিশ-পঁচিশ বয়সের ছেলে কোদাল হাতে ক্ষেতের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ভাবলুম এই ছেলেটাই বোধ হয় টঙটার মালিক। হঠাৎ খিলখিল করে একটা দুরন্ত বন্য হাসি ভেসে আসতেই চমকে উঠলাম, ঠিক সেই

মোহিনীর বাঁশীর মত—মহুয়ার মত মিষ্টি! মুখ বাড়িয়ে দেখলুম—হাঁ, বন-মোহিনীই বটে, হাসছিল এক অরণ্য কন্যা,—হাঁটু-ডোবা আঁটসাঁট ডুরে শাড়ী পরা। এই না দেখে যেই ফিরে আসবো, অমনি টুকান বলে কে ডেকে উঠলো। মুহূর্তে হরিণীর বেগ নেমে এল মেয়েটির ধূলোমাখা লঘু পায়ে, চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল গাছগাছালির আড়ালে। আর ছেলেটি কোদাল দোলাতে দোলাতে হাসিমুখে চলে গেল সেই দিকে, যে দিক থেকে ডাকটা এসেছিল। এমন একটা রমণীয় দৃশ্যের অকস্মাৎ এমন ছন্দপতন ঘটায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। টঙটার কাছে আর যাওয়া হলো না, জলাভূমির ধারে পাথরের যে বড় চাতালটা রয়েছে তার ওপর বসে সিগারেট খেতে লাগলাম। বদ্ধ জলার গুমোট্ ভেঙ্গে তখন চৈতি বাতাস বইতে শুরু করেছে।

এই জলাভূমির কথা বারবার বলেছি। পশ্চিমের বনে যেতে হলে জলা-ভূমিটা পার হতেই হবে। দলদলে কাদা, আগাছার নিবিড় ঝোপঝাড় আর বড় বড় ঘাসের নীচে স্থানে স্থানে সঞ্চিত কর্দমাক্ত ঘোলা জল। ইতস্তত জড়ান গাছ-পালা অসংখ্য বুনো লতায় সমাচ্ছন্ন, ফলে গাছগুলোর বাড়বৃদ্ধি হ্রাস পেলেও রূপ খুলেছিল ঢের। সাদা, বেগুনী ও হাল্কা গোলাপী রঙের ফুলের বাহারে জলার সৌন্দর্য কিছু অবহেলার নয়। আর কালো রঙের মস্ত পাথরের চাতালটা হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে যেন ক্লান্ত পথিককে আহ্বান জানায়। তার আশেপাশে পাথরের আর কোন চিহ্নই নেই, তবু মনে হবে জলার সঙ্গে পাথরটারও যেন কোন সঙ্গতি রয়েছে--যদিও পাথরটার সেখানে থাকার কথা নয়। বর্ষার জলে ধুয়ে ধুয়ে যেমন মসৃণ তেমনি চকচকে। জলবহা লম্বা লম্বা শিরাগুলোর ফাঁকে জমে রয়েছে রৌদ্রের তেজে ফাটা ফাটা ধূলোর আস্তরণ। কিছু কিছু ঘাসও গজিয়েছে, চেহারা দেখলেই বোঝা যায় পাথরের বুকেও রসের অভাব হয়নি।

বেলা-শেষের পড়ন্ত রোদ্দুরে ঘাসের বুকের ম্লান আলোটুকু কুড়িয়ে নিয়ে গাছের মাথায় ঝলমলিয়ে উঠল। লাল গোলার মত সূর্য রোদ-ঝলসানো গাছগাছালির আড়াল দিয়ে পাহাড়ের ও-ধারে টুপ করে নেমে যেতেই জলার বুকে আলো ফুরিয়ে গেল। এক ঝাঁক পাখী ক্লান্ত ডানার ঝাপটা মেরে জলার শান্ত বাতাসে ক্ষণিকের আলোড়ন তুলে গেল। ফুটন্ত বুনো লতা ফুলেরা চুপসে যাওয়া পাপড়ী গুটিয়ে নিল। কেমন বিষণ্ণ মলিন হয়ে উঠলো জলার আলো-আকাশ-মাটি! ধূসর অন্ধকার নেমে এসে তার ওপর এক আশ্চর্য প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে গেল!

এ পথে এতবার যাতায়াত করেছি, কখন চোখে পড়েনি, পড়তোও না—যদি না সেদিন চাতালটায় বসতাম। হঠাৎ লক্ষ্য পড়লো পাথরের সেই চাতালটা—যেখানে আমি তখন একাকী বসেছিলাম, সেই কালো পাথরটার পঁচিশ-ত্রিশ হাত দূরে, যেখানে বন থমকে রয়েছে জলার সান্নিধ্য বাঁচিয়ে, সেই পোড়ো জমিটা একটা গো-ভাগাড়। গরুর কিছু সাদা কঙ্কাল হঠাৎ চোখে পড়লো।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে তখন চতুর্দিক ছেয়ে গেছে, আকাশের অস্পষ্ট আলোয় চিক্‌চিক্ করে উঠেছে অসংখ্য তারা। রাইফেলটা কোলের ওপর রেখে উঠবো উঠবো করছিলাম, ভাবনাগুলোকে গুটিয়ে নিচ্ছিলাম। দিনটা অকাজেই কেটে গেল, চিতার সন্ধানে যেমন যাওয়া হলো না—তেমনি দেখা হলো না আমার সাধের টঙ—টুকানরা সব ভণ্ডুল করে দিল।

মহুয়া গাছের মাচায় বা জঙ্গলে টহল দিয়ে অথবা চলাচলের মোক্ষম পথ আগলে চিতাটাকে মারার বিশেষ সম্ভাবনা আর ছিল না। অনেক হয়রানি সহ্য করে অনেক নিষ্ফল রাত তো জেগে কাটালাম, এখন হাঁকোয়াই আমার শেষ ভরসা। বুঝতে পারলাম সেরা মুঙ্গলী, আঙ্গুল ও সম্বলপুরের শিকারীরা কেন ওর পেছনে ধাওয়া করা ত্যাগ করেছিল।

এমন সময় গো-ভাগাড়ের সেই আবছা অন্ধকারে কালো মতন কি একটা জানোয়ার ছুটে গেল। রাইফেলটা মুহূর্তে তুলে ধরলাম। জানোয়ারটার আকৃতি দেখে বুঝতে পারলাম চিতা নয়। বড় জানোয়ার, সম্বর বা বাইসন্ হলেও হতে পারে। যদি বাইসন্ হয়—এই আশঙ্কায় রাইফেল তৈরী রেখেই স্থির হয়ে বসে রইলাম। অনেকক্ষণ পরে—তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, আমার ডানদিকের জঙ্গল ভেদ করে কালো মতন জানোয়ারটা তীর-বেগে ছুটে চলে গেল। পরক্ষণেই দেখতে পেলাম, ঠিক তেমনি ভাবেই সে ফিরে আসছে, শিং নীচু করে তড়বড় করে গো-ভাগাড়ের অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল।

এইভাবে জন্তুটা আমার রাইফেলের সামনে দিয়ে তিন-চারবার যাওয়া-আসা করলো। অন্ধকারের দরুণ বা দ্রুত বেগের দরুণ ঠিক বুঝতে পারলাম না জন্তুটা কি! কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারলাম না, একটা বুনো জন্তু মানুষ দেখেও বিনা কারণেই হোক বা কারণেই হোক—একই পথ ধরে বার বার কেন যাওয়া-আসা করবে! শিং নীচু করে কি আমাকেই আক্রমণ করতে চায়, না আর কোথাও তার শত্রু লুকিয়ে রয়েছে!

তারপর কয়েক মিনিট আর তাকে দেখা গেল না। হঠাৎ আমার বাঁ-দিকের ঘাসবন ফুঁড়ে তীব্রবেগে সে ধেয়ে এল, পাথরের চাতালটায় ধাক্কা মারে আর কি, রাইফেলের নলের ঠিক এক-হাত দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল। গতিক সুবিধার নয় ভেবে চলে আসবার জন্য যেই চাতালটা থেকে নেমে দাঁড়িয়েছি, অমনি হুস করে আমার পাশ দিয়ে গো-ভাগাড়ের দিকে চলে গেল। এইবার তাকে পরিষ্কার দেখতে পেলাম, লাল রঙের একটা দিশী গরু। জন্তুটা সম্বরও নয়, বাইসন্‌ও নয়—গ্রামেরই কোন গরু কিভাবে পালিয়ে এসেছে। আমার কাছে একগাছা দড়ি থাকলে ফাঁস লাগিয়ে ধরে ফেলতে পারতাম। যাই হোক এখন তাড়াতাড়ি গ্রামে ফিরে খবর দিতে হবে, নইলে চিতার কবলে পড়ে মারা পড়বে।

পথটার ওপর থেকে নেমে গ্রামের দিকে পা বাড়াবো, অমনি দেখতে পেলাম ভয়ানক বেগে সে ছুটে আসছে। প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে আর কি, লাফিয়ে পাথরটার ওপর উঠে দাঁড়ালাম—আমার বাঁ-পাশ দিয়ে সাঁ করে চলে গেল।

গরুটা নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছে, জলার কোন বিষাক্ত গাছপালা খেয়ে থাকবে। গরুটা কোথায় গেল দেখবার জন্য পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি রুদ্রমূর্তিতে সে ধেয়ে আসছে। রাইফেলের নল বাড়িয়ে ধরলাম, এবারও সে হাতখানেক দূর গিয়ে বনবাদাড় মাড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। হঠাৎ মনে হলো, গরুটাকে যা ভাবছি—ও তা নয়! গো-ভাগাড়ের গো-ভূত! পাথরটা থেকে এক লাফে বনে পড়েই উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিলাম, যতক্ষণ না পাকৃদণ্ডির কাছে এসে পৌঁছলাম। পাকৃদণ্ডি বেয়ে নামতে নামতে মনে পড়লো অনেক দিনের একটা পুরনো ঘটনা। তখন শুনেছিলাম, এদের একটা নির্দিষ্ট সীমা থাকে—তার বাইরে যেতে পারে না।

অনেক দিন আগে আমাদের গ্রামে মাদারিয়া-খালের ধারে এক গো-ভাগাড়ে এমনি এক গো-ভূতের পাল্লায় পড়েছিলাম। সেদিন ছিল বর্ষার এক নিঝুম সন্ধ্যা, চতুর্দিকেই জল কাদা প্যাচ প্যাচ করছিল, ব্যাঙ ডাকছিল। তখন পল্লীগ্রামে বিদ্যুতের আলো যায় নি। ঘুটঘুটে অন্ধকারে হাটতলা থেকে পেঁড়োগড়ের দিকে যাচ্ছিলাম। গো-ভাগাড়ের পাশ দিয়েই গড়ে যাবার কাঁচা রাস্তা, হঠাৎ কালো মতন একটা গরু একছুটে রাস্তাটা পেরিয়ে গেল। থমকে দাঁড়ালাম, গরুটাকে বাঁশঝাড়ের অন্ধকারে দেখতে পাইনি ভেবে আবার যেই পা বাড়ালাম, অমনি

গরুটা সাঁ করে রাস্তা পেরিয়ে গো-ভাগাড়ের দিকে চলে গেল। অন্ধকারে কালো রঙের গরুটাকে কোথাও দেখতে পেলাম না। এইভাবে বার তিন-চার রাস্তা পারাপার করে আমার পথ আটকে দিতেই কেমন ভয় হয়েছিল, হাটতলায় আবার ফিরে মাদারিয়ার বাঁধের ওপর দিয়ে গড়ে পৌঁছলাম। আমার ভগ্নিপতি গোপাল চাটুজ্জের বেশ নামডাক আছে, তখন কেত্তন গাইছিল—শুনে বলেছিল সেও অনেকবার দেখেছে। তবে রঙটা শুধু কালো নয়, সাদা—এমন কি তার ফোঁসফোঁসানি পর্যন্ত শুনতে পেয়েছিল।

যাঁরা এ-ঘটনা বিশ্বাস করেন না, তাঁরা মাদারিয়ার খালের ধারে বা পেঁড়োর গো-ভাগাড়ে গিয়ে পরীক্ষা করে আসতে পারেন। হাটতলায় হারু পালের চায়ের দোকানে আমার নাম করলেই দেখিয়ে দেবে এবং আরও শুনবেন গো-ভাগাড়ের জমিতে সম্প্রতি পাকা বাড়ি তুলে সাঁতরারা কিন্তু সুখে-স্বচ্ছন্দেই আছে, কোন উপদ্রবই নেই। আর গয়লাপাড়ায় মাষ্টারমশাইয়ের বাড়িতে অনেকদিন আগে চার-পাঁচ ক্রোশ দূরের দয়ের লাল-মাটির চাঙড় কেমন করে এসে পড়তো বা তক্তাপোসের তলা থেকে নূতন আলু কেমন করে শূন্যে লাফালাফি করতো—সে খবর শুনতেও ভুল করবেন না। কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসের সঙ্গে ভূত-প্রেত বা অশরীরির অস্তিত্বকে স্বীকার করার সঙ্গতিহীন সিদ্ধান্ত তখন আপনার ওপরই বর্তাবে। চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হওয়াই শ্রেয়।

যাই হোক—সে রাতটা আমার বাংলোয় নিরুপদ্রবে কাটলেও বাক্‌লা-বাসীদের ভাগ্যে কিন্তু তা ঘটেনি। মাঝরাতে উঠে হৈ-হল্লা করে টিন পেটাতে হয়েছে, উত্তেজনায় ছোটাছুটি করতে হয়েছে। তার পর গোয়ালঘরের ভাঙ্গা আগল ধরে হায় হায় করে আফশোসে আর দুঃখে নিরর্থক গাল পাড়তে হয়েছে শয়তান চিতাটাকে উদ্দেশ্য করে।

সারারাত ধরে এত কাণ্ড হয়েছে, অথচ দুর্গাপুর ডাকবাংলোয় আমি কিছুই টের পাইনি। ভোর হতেই চূড়ামণি, হলধর ও জানকীরা ছুটে এসে শুনিয়েছিল সেই দারুণ খবর! চিতাটা গতরাত্রে বাক্‌লা গ্রামে আবার একটা বাছুর মেরেছে। মড়ির সন্ধান করে মাচা বাঁধবার কথা বলতে গেলাম, এমন সময় বাক্‌লার লোকজন এসে হাজির। তারা জানালো—বেলা বারোটার পর হাঁকোয়া হবে, গ্রামের মাতব্বররা অনুরোধ করে পাঠিয়েছে, আমি যেন যথা-সময়ে সেখানে উপস্থিত থাকি।

অনেকদিন ধরে এই হাঁকোয়ার অপেক্ষায় ছিলাম। সেই হাঁকোয়ার নিমন্ত্রণ

অবশেষে এসে পৌঁছুল। বলা বাহুল্য—চূড়ামণি, হলধর ও জানকীকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যথাসময়েই উপস্থিত হয়ে দেখলাম, মস্ত এক দল প্রায় তিরিশ-চল্লিশ জন লোক জড় হয়েছে। মাতব্বর বললো, ভোরবেলা তারা দেখে এসেছে জলার ওপরে বনের মধ্যে যে নালাটা আছে, সেইখানেই বাছুরটাকে যতটা পারে খেয়ে ফেলে রেখে গেছে। আমি লক্ষ্য করলাম, আমার রাইফেল ছাড়া আরও দুটো গাদা বন্দুক বেরিয়েছে, তীর-ধনুক-বল্লম তো ছিলই। যাই হোক—জলাভূমি পার হয়ে নালার এপারের বনে পৌঁছতেই হাঁকোয়ার দল অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে জায়গাটা ঘিরে ফেললো। বন্দুকধারীরা অর্থাৎ শিকারীরা নিঃশব্দে নালা পার হয়ে প্রায় মাইলখানেক গভীর জঙ্গলে পৌঁছে বসার উপযোগী জায়গা বেছে নিতে লাগলো। ভাল জায়গার জন্য সকলেই উৎসুক, সকলেই চায় চিতাটা তারই সামনে বের হোক এবং গুলি খেয়ে মারা পড়ুক।

আমি শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেতে একটা ভাঙ্গাচোরা খোয়াইয়ের ধারে বসলাম এবং বসামাত্রই শুনতে পেলাম হাঁকোয়া শুরু হয়ে গেছে। প্রথমে এদের তোড়-জোড় দেখে মনে হয়েছিল হাঁকোয়া শিকারের কায়দা-কানুন হয়তো ভালই জানে, কিন্তু পরে আমাকে অত্যন্ত হতাশ হতে হয়েছিল। হাঁকোয়া হচ্ছিল খুব ছোট ছোট এলাকা ঘিরে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই দেখলাম হাঁকোয়ার লোকজন সামনে এসে হাজির। একটা খরগোস পর্যন্ত চোখে পড়েনি। এইভাবে জঙ্গলের ছোট ছোট এলাকা ঘিরে পর পর তিন বার হাঁকোয়া হলো—কিছু পাখী, বন-মোরগ ও একটি ময়ূর ছাড়া আর কিছুই সেই হাঁকোয়ায় বেরিয়ে এল না। সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো হাঁকোয়া, তিরিশ-চল্লিশ জন লোক বেমক্কা বন পিটিয়ে—হল্লা করে সমস্ত পরিকল্পনাটাই পণ্ড করে দিল।

এমন সময় একজন বাঁটার বললো, সে দেখেছে বনের দু'পাশ দিয়ে শুয়োর আর কোটরাকে চলে যেতে। হাঁকোয়া শেষ হতেই মাতব্বরদের বুঝিয়ে দিলাম, কি ভাবে হাঁকোয়া করলে জন্তুকে হাঁকোয়ার বেড়ের মধ্যে রাখা সম্ভব হবে। অর্থাৎ ষ্টপারের (Stopper) ব্যাপার বুঝিয়ে দিলাম। সকলেই বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, মাতব্বররা ঘোষণা করেছিল, আগামী কাল সকাল আটটায় আবার হাঁকোয়া হবে।

দ্বিতীয় দিনের হাঁকোয়া আরও দক্ষিণদিক ঘেঁসে করা হলো। হাঁকোয়ার এলাকা দেখিয়ে দিয়ে প্রথমেই হাঁকোয়ার দলকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিলাম। শিকারীদের বসার জায়গা আগেই নির্বাচন করে রেখেছিলাম, এর পরের কাজ

হলো ষ্টপারদের যথাস্থানে বসিয়ে দেওয়া। ছোট হাঁকোয়া আমিও পছন্দ করি, এক মাইল-দেড় মাইলের মধ্যেই হাঁকোয়াকে বেঁধে রাখা ভালো। হাঁকোয়া ও শিকারীর মাঝখানের জঙ্গলে জন্তুজানোয়ার থাকে, হাঁকোয়ার সাড়া পেলেই বুঝতে পারে পিছনে মানুষ আসছে। অতএব পালাবার পথ সামনে, অথবা দু'পাশের জঙ্গল ভেদ করে যাওয়া। দু'পাশের জঙ্গল ভেদ করে যাতে পালাতে না পারে, তার জন্যই প্রয়োজন ষ্টপার বসানো। আমি তিনজন করে মোট ছ'জন ষ্টপারকে দু'পাশের জঙ্গলে বসিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম কি তাদের করতে হবে। উঁচু গাছ দেখে ষাট-সত্তর গজ অন্তর ষ্টপারদের বসিয়ে দেওয়া হলো।

ষ্টপারদের কাজ হলো গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকা। যদি দেখে হাঁকোয়ার জন্তু-জানোয়ার তাড়া খেয়ে সামনের দিকে না গিয়ে পাশের জঙ্গল ভেদ করে পালাবার মতলব করছে, তাহলে গাছের ডালে টাঙ্গির বাঁট ঠুকে ঠক্‌ঠক্ শব্দ করবে, কিন্তু মুখে হো-হা বা কোনরকম হল্লা করবে না। পালাবার জন্য যে জন্তু সামনের দিকে না গিয়ে পাশের জঙ্গলের দিকে মুখ ফিরিয়েছে, সে ভাববে—পিছনেও মানুষ, পাশের জঙ্গলেও মানুষ রয়েছে—অতএব সামনের দিকে অর্থাৎ শিকারীর দিকেই তখন গুটি গুটি এগিয়ে আসবে। ভাববে —এদিকটাই নিরাপদ পথ।

যদি সেই বাঁটে বাঘ থাকে, আর হাঁকোয়ার তাড়া খেয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে তা হলেই সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে। তখন ষ্টপারকে খুব সাবধানে থাকতে হয়। ঠিক সময় মত ঠক্‌ঠক্ শব্দ না করে যদি ভয়ে চিৎকার করে ওঠে, অথবা আরও উঁচু ডালে উঠে যেতে চেষ্টা করে তাহলে সেই ষ্টপারের কপালে দুর্গতি লেখা আছে ধরে নিতে হবে। উত্তেজিত বাঘ মুহূর্তের মধ্যে আক্রমণ করে বসবে, নয়তো রাগে লাফাতে লাফাতে সামনের দিকে ছুটে আসবে। যদি শিকারীকে দৈবাৎ দেখতে পায় তো নির্ঘাৎ লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ে। হাঁকোয়া শিকারের মত এমন উত্তেজনা আর কিছুতে নেই, যে কোন মুহূর্তে যে কোন ঘটনা ঘটে যেতে পারে।* সেই স্তব্ধতা ভেদ করে বাটারদের দূরাগত 'হো-হা' ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসে। ক্রমে সেই শব্দ স্পষ্ট হয়, তালে তালে এগিয়ে আসে অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে। সাড়া পড়ে যায় অরণ্যের গভীরে—পাতা কাঁপে, দুলে ওঠে ঝোপ, ঝাড়ের মাথা, কোথাও গুঁড়িয়ে যায় বনের শুকনো ঝরা পাতা, কলরব করে ওঠে

* বাংলার বিখ্যাত শিকারী কুমুদ নাথ চৌধুরী নড়পার জঙ্গলে এই রকম এক হাঁকোয়া শিকারে বাঘের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছিলেন।

ছাতারে পাখী। তারপর হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় বন, কোথাও আর কোন সাড়াশব্দ থাকে না। সামান্য একটা শুকনো কাঠি ভাঙ্গার অত্যন্ত ক্ষীণ শব্দ যে কি ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন দ্রুততর হয়ে ওঠে, শিরায় শিরায় নেচে বেড়ায় এক অস্থির উত্তেজনা—যা ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চের সৃষ্টি করে। দু'চোখের বিস্ফারিত তারা ইঞ্চি ইঞ্চি করে নিরীক্ষণ করে জমি, দু'কানের সূক্ষ্ম পর্দায় কি এক অজানা অনুভূতি হিস্‌-হিস্‌ করে ওঠে সঙ্গোপনে, যা উপলব্ধি করার অবকাশ দেয় না—বিস্ময়ে বিমূঢ় করে তোলে শুধু! এ-হেন মুহূর্ত হাঁকোয়া-শিকারের বৈশিষ্ট্য!

হঠাৎ বুঝতে পারলাম হাঁকোয়া শুরু হয়ে গেছে, বীটারদের দূরাগত হো-হা শব্দের ক্ষীণ রেশটুকুও তখনও কানে পৌঁছয় নি, সাড়া জাগেনি জঙ্গলেও—নীরব, নিস্পন্দ, স্তব্ধ হয়ে রয়েছে।

বুকের মধ্যে দুর্‌-দুর্‌ করে ওঠে একটা ক্ষীণ আশা, চিতাটা কি বেড়ের মধ্যে আছে! যদি থাকে—কোন নালায় শুয়ে নিশ্চয়ই বীটারদের শব্দ কান পেতে শুনছে, সন্দেহ গভীর না হলে অনড় হয়ে থাকবে সেখানে কান খাড়া করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে। তার পর হয়তো একসময় বনের কোন সুঁড়িপথ ধরে গভীর অঞ্চলের দিকে সন্তর্পণে থাবা বাড়াবে। শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে যাবে না, শুকনো কাঠি ভেঙ্গে পড়বে না—এমনি চুপি চুপি তার চলাফেরা। হাঁকোয়া শিকারে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে বাঘ বা চিতাবাঘ বের হয় সব শেষে। বনের অন্যান্য পশুপক্ষীরা বন ফাঁকা করে চলে যাবার পরই গুটিগুটি এগিয়ে আসে—দু-চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সন্দেহ ও বিরক্তি ছড়াতে ছড়াতে এবং সেই চরম মুহূর্তটি যে কখন আসবে—কেউ বলতে পারে না। মনে হয়—হঠাৎ, আচমকা, আচম্বিতে শব্দগুলো যেন এমন মুহূর্তের জন্যই তৈরী হয়েছিল।

এ জঙ্গলে আবার বাইসন্‌ও থাকে। আমি নালার ধারে যে ঝোপের পিছনে লুকিয়ে বসেছিলাম, সেটাও পালাবার একটা পথ। এক ঝাঁক পাখী ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। তার পর উঠলো একটা কলরব, পাঁশুটে রঙের ছাতারে পাখীর ঝাঁক মাটি ছুঁই-ছুঁই করে চেঁচাতে-চেঁচাতে শিকারীদের মাঝখান দিয়ে পিছনের বনে চলে গেল। আর কোন সাড়াশব্দ রইলো না, যেন বনে আর কোন প্রাণী নেই। শুকনো পাতার একটা অস্পষ্ট খড়খড় শব্দ কানে আসতেই চোখ ফিরিয়ে দেখতে পেলাম একটা বন-মোরগ সন্দেহ আর সংশয়ে এক পায়ে মাথা উঁচিয়ে দৃপ্ত-ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখের চঞ্চল তারা দুটো বনের কোণ

থেকে কোণ পর্যন্ত দেখে নিল, তার পর লম্বা পা বাড়িয়ে নিঃশব্দে বিপদের এলাকাটুকু পার হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে আবার বীটারদের 'হো-হা, হো-হা' শব্দ ভেসে এল। সেই শব্দ শুনে একটা মেটে রঙের খরগোস চোখ-কান বুজে পড়ি-কি-মরি করে ছুটে এল ময়ূরের তীক্ষ্ণ ডাক ভেসে এল, অল্পক্ষণ পরেই দেখলাম দীর্ঘ পুচ্ছ দুলিয়ে মাথার ওপর দিয়ে সোঁ-সোঁ করে উড়ে গেল। এক পাল বন-শুয়োর কিছু না দেখেশুনে গোঁয়ারের মত আমার পাশের নালায় নেমে ঠেলাঠেলি করতে করতে দ্রুত কোথায় অন্তর্ধান করলো। তার পর কিছুক্ষণের বিরতি, কোন উত্তেজনা নেই, কোন চাঞ্চল্য নেই। হঠাৎ দুড়দাড় করে লাফাতে লাফাতে চার-পাঁচটা হায়না ছুটে এল। একটা মাদী হরিণ ঝোপের আড়ালে এসে কখন দাঁড়িয়েছিল চোখে পড়েনি, হঠাৎ সে কান নাড়তেই দেখতে পেলুম। বীটারদের আবার চিৎকার ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই হরিণটা স্প্রীংয়ের মত শূন্যে লাফিয়ে উঠলো, তারপর কখন মাটি ছুঁয়ে আর এক লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল বুঝতে পারা গেল না। তার পিছনে ছোটখাট একটা চিতল হরিণের দল ছটফট করছিল, ঘন ঘন কান ঘুরিয়ে শব্দ শুনছিল, হঠাৎ দেখি তারাও কখন শূন্যে ভেসে উঠেছে। সেই একই ভঙ্গিমায় বনের অপ্সরারা বনের গভীরে কোথায় মিলিয়ে গেল।

বন আবার নিস্তব্ধ হয়ে উঠেছে, চিতার খবর তখনও পাওয়া যায়নি। চতুর্দিকে কেমন এক অস্বাভাবিক থমথমে ভাব বিরাজ করছিল। বীটাররা তখন অনেক কাছে এসে গেছে, হঠাৎ একটা তীব্র কোলাহল উঠল—সেই সঙ্গে গ্রামের কুকুরদের উত্তেজিত ডাক। চমকে উঠলাম! কিন্তু পরক্ষণেই সব হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেল, কোথাও টুঁ শব্দটি পর্যন্ত রইল না। মাঝে মাঝে শুধু ঝিঁঝিঁর ডাকের ওঠানামা চলছিল।

বীটারদের হঠাৎ এ-হেন উত্তেজিত চিৎকারের অর্থ আমার জানা ছিল, চিতার গায়ের গন্ধ না পেলে কুকুরগুলোও এমন ডেকে উঠতো না। রাইফেলটা শক্ত করে ধরে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম, কিন্তু কোন নড়াচড়ার আভাসটুকুও চোখে ধরা পড়লো না।

এমন সময় একটা শিস্ দেওয়ার শব্দ হলো। একমাত্র আমিই মাটিতে বসেছিলাম, আর অন্যান্য শিকারীরা ছিল গাছের ওপর এবং শিস্টা এসেছিল সেই রকম কোন গাছ থেকে। সম্ভবত গাছের শিকারীরা চিতাটাকে দেখে থাকবে ভেবে, রাইফেল বাগিয়ে চিতাটা খুঁজতে লাগলাম, কিন্তু সন্দেহ করবার মত

কিছুই দৃষ্টিগোচর হলো না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন বীটাররা আর সাড়া দিল না, বন্দুকেরও কোন আওয়াজ হলো না, তখন চিন্তা হলো চিতা কি তাহলে ষ্টপারদের দিকে গেছে! যদি তাই গিয়ে থাকে, তাহলে কোন দিকে, আমার ডানদিকে—না, বাঁদিকে। কান পেতে রাখলাম—কিন্তু ষ্টপারদের কোন ঠক্ ঠক্ শব্দ এল না। খুবই অস্বস্তিকর পরিবেশ, সামান্য একটু ইঙ্গিত দিয়েই হঠাৎ এভাবে একবারে চুপ হয়ে যাওয়া! ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর রইলো না।

এমন সময় দেখতে পেলাম বীটাররা এক-এক করে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে, দ্বিতীয় দিনের বীট শেষ হয়ে গেল। যারা আমার দিকের জঙ্গল থেকে প্রথমে বেরিয়ে এল, বললো—চিতাটাকে বনের বাঁ-দিক ধরেই নেমে আসতে তারা দেখেছে। কিন্তু চিতা আমার দিকে আসেনি. আমি তাকে দেখতেই পাইনি। তাহলে সে গেল কোথায়? আমার সন্দেহ হলো, নিশ্চয়ই পাশের জঙ্গল ভেদ করে পালিয়েছে, ষ্টপার ভয়ে কোন শব্দ করেনি। অন্যান্য শিকারী ও ষ্টপাররা ততক্ষণে এসে জড় হয়েছে। মাতব্বরদের নানা জেরা করা সত্ত্বেও কোন ষ্টপারই স্বীকার করলো না যে, তারা চিতাটাকে দেখেছে পাশের জঙ্গল ভেদ করে পালাতে। চিতার এভাবে অদৃশ্য হওয়া নিয়ে অনেক কথাই হলো, এমন কি দুষ্ট আত্মা, মোহিনী পর্যন্ত এসে পড়লো। অবাস্তব কিছু মুখরোচক্ আলোচনা পেলে কেউই সহজে থামতে চায় না।

পর পর দু'দিনের হাঁকোয়া ব্যর্থ হওয়ায় খুবই হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, মাতব্বরদের বললাম, যেমন করেই হোক আমাকে একটা ছাগলের টোপ যোগাড় করে দিতে, কিন্তু তারা ঘাড় নেড়ে জানালো—টোপ্ কোথায় পাবো, গাঁয়ে তেমন ছাগল আর কই! সবই তো চিতা একের পর এক নিয়ে গেছে। আপনি চিন্তা করবেন না বাবু, দেখুন আগামীকাল আর একটা হাঁকোয়া করছি, চিতা ঠিক বেরিয়ে আসবে। কি আর করা যাবে, অগত্যা সেই কথাই মেনে নিতে হলো। তখন প্রচণ্ড রোদ্দুর উঠে পড়েছে, বাছুরের মড়িটার সন্ধান করা শক্ত, তাছাড়া বত্রিশ-তেত্রিশ ঘণ্টা পরে তার কিছু অবশিষ্ট রয়েছে কি-না সন্দেহ!

পর পর দুটো হাঁকোয়া ব্যর্থ হওয়ায় বাকুলা বাসীদেরও জেদ বেড়ে গিয়েছিল। সকাল আটটায় গতদিনের পদ্ধতি অনুসরণ করেই তৃতীয় দিনের হাঁকোয়া শুরু হয়েছিল। আমি যথারীতি মাটিতে একটা শুকনো নালার ধারে বসেছিলাম, আমার হাতে দূরপাল্লার রাইফেল ছিল বলে বাঁ দিকের বিস্তৃত

অঞ্চলের ওপর লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব আমার ওপরই বর্তাল। চূড়ামণি হাঁকোয়ার দলে না গিয়ে চুপিচুপি এসে আমার পিছনে বসে পড়লো। মানুষের মন কত তুচ্ছ কারণেই সময় সময় এমন হীন হয়ে পড়ে! চূড়ামণিকে আমার পিছনে বসতে দেখেই মনে হলো, গতকাল চিতাটা আমার দিকেই নেমে এসেছিল, অথচ আমি তাকে দেখতে পাইনি—এ-কথায় বাক্লার কোন মাতব্বরের মনে কি সন্দেহ দেখা দিয়েছিল! আর সেই কারণেই চূড়ামণিকে পাঠিয়েছে আমার ওপর খবরদারী করবার জন্য! কিন্তু চূড়ামণিকে আমি চিনি, অনেকদিন ধরে মিশেছি—তাছাড়া চূড়ামণি আমাকে ভালবাসে, সে-কথা প্রমাণের কোন অপেক্ষা রাখে না। ওর সরল হাসি দেখে লজ্জায় মাথা তুলতে পারলাম না।

এমন সময় গাছপালার ফাঁক দিয়ে আমার বাঁ-দিকের শেষ ষ্টপারকে দেখতে পেয়ে চূড়ামণি হেসে হাত নাড়লো। জিজ্ঞাসা করলাম, ও কে? চূড়ামণি বললো—টুকান, আমার সঙি। হাঁকোয়া শুরু হয়ে গেল, আর কোনরকম নড়াচড়া না করে স্থির হয়ে জঙ্গলের দিকে চেয়ে রইলাম। কথায় বলে বার-বার তিন-বার, তিন-বারের সেই হাঁকোয়া তখন শুরু হয়ে গেছে।

শান্ত, স্তব্ধ জঙ্গল এবার ভয়ানক হয়ে উঠবে, আতঙ্কিত বন্য প্রাণীরা প্রাণভয়ে যে কোন মুহূর্তে হুড়মুড় করে ঘাড়ের ওপর এসে পড়বে। বীটারদের আওয়াজ তখনও কানে এসে পৌঁছয়নি, তবু জঙ্গলের প্রাণীদের মধ্যে এক আশ্চর্য সাড়া পড়ে গেল। সর্বপ্রথমে দেখা দিল এক মস্ত ভালুক, হেলতে দুলতে বেরিয়ে এল বন থেকে। ভালুকের ঘ্রাণশক্তি যেমন তীক্ষ্ণ, দৃষ্টিশক্তি তেমনি ক্ষীণ, তবু অত্যন্ত বেপরোয়া প্রাণী। সাবধানে চলা-টলা এদের ধাতে নেই, শুকনো পাতার ওপর দিয়ে মড় মড় শব্দ করতে করতে সোজা আমার নাক বরাবর নেমে এল। আমি এতটুকু নড়াচড়া না করে চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম আমার রাইফেলের ঠিক দু'গাছ দূর দিয়ে নালায় নেমে নির্ভাবনায় বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রায় আধ মিনিট ধরে আমি তার চলার আওয়াজ শুনতে পেলাম।

এরপর দ্বিতীয় প্রাণী এল—একটা বেজী। মাটিতে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে কিছুদূর এসেই হঠাৎ পিছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে মুখ উঁচু করে দাঁড়ালো, তার পর সামনের দুটো থাবা দিয়ে নাকটাকে একটু চুলকে আবার খর্ খর্ করে এসে সেই নালাতেই নেমে গেল। পর পর দুটি প্রাণীকে একই পথে যেতে দেখে ভাবলাম, চিতাটা যদি বেড়ের মধ্যে থাকে, সে-ও এদের পথ অনুসরণ করতে পারে! সেই নিস্তব্ধতায় কতক্ষণ ডুবে ছিলাম জানি না, হঠাৎ শুকনো পাতার খড় খড় শব্দ

হলো। শব্দটা কিন্তু কয়েক-পা এসেই থেমে গেল। প্রায় আধ-মিনিটি আর কোন শব্দ নেই, একেবারে নীরব নিস্তব্ধ! তারপরে আবার খর খর করে উঠলো, আবার ক্ষণিকের বিরতি। এইভাবে শব্দের সেই গতি কখন দ্রুত আবার কখন মন্থর হতে হতে একেবারে চুপ হয়ে গেল। উদগ্রীব হয়ে উঠলাম, জন্তুটা কি! কতক্ষণ ধরে চললো শব্দের সেই খেলা, রহস্যময় জীবটি যথেষ্ট কৌতূহলের সৃষ্টি করে অত্যন্ত সন্তর্পণে ঝোপের মধ্য থেকে এক সময়ে মুখ বাড়ালো।

শব্দের গতিপ্রকৃতি দেখেই ধরে নিয়েছিলাম কোন ছোটখাট জন্তু। মুখ বার করতেই দেখতে পেলাম বনের সব থেকে হুঁসিয়ার প্রাণী, যার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না। অত্যন্ত সাবধানীর মত সযত্নে একটি পা বাড়িয়ে একেবারে স্থির হয়ে গেল। বনে তখন সূচ পড়লেও বুঝি শোনা যায়, ধীরে ধীরে সামনে এসে দাঁড়ালো একটা ময়ূর-বনের শোভা! বিপদের কোন চিহ্ন চোখে না পড়ায় বিরাট পুচ্ছ দুলিয়ে দুলিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিমায় উন্নত গ্রীবায় ছন্দের দোলা দিয়ে গরবে নাচতে নাচতে আমার ডানদিক দিয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

তার পরেই শুরু হয়ে গেল এক বিচিত্র হট্টগোল। ময়ূরটা যেন পক্ষিকুলের পথ খুলে দিয়ে গেল। দেখতে দেখতে এক ঝাঁক মনুয়া পাখী, মধুভুক্ স-রবে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। বন-টিয়া আকাশ ফাটিয়ে ডেকে উঠলো, টিঁয়া-টিঁয়া-টিঁয়া—তাদের অনুসরণ করলো আরো কত নাম-না-জানা পাখী। সেই শব্দ মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই এসে পড়লো দাঁতাল বরা, তার পিছনে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ধাড়ী শুয়োর। বনের আর একধার দিয়ে চুপিচুপি সরে পড়লো হায়না। সেই বিশাল আকারের নেকড়েটাও এক সময় পথ করে নিল। একটা মাদী সম্বর তার বিশাল দেহ নিয়ে ঘোড়ার মত হুড়মুড় শব্দে বনবাদাড় ভেঙ্গে পালাল। থমকে দাঁড়ালো চিত্রিত হরিণ, কোন দিকে যাবে! চতুর্দিকেই মানুষের গায়ের গন্ধ! গভীর আতঙ্কের ছায়া নেমে এসেছে চঞ্চল কালো চোখে, তিড়িং করে ভেসে উঠলো বাতাসে, মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। বীটারদের আওয়াজ ক্রমশই জোর হচ্ছিল। সে এক দারুণ উত্তেজনার মুহূর্ত, চমকের পর চমক সৃষ্টি হচ্ছিল।

হঠাৎ বীটারদের প্রচণ্ড চিৎকার ভেসে এল—'হো-হা-হো-হা-হ-র্-র্' সেই চিৎকার শুনে চমকে রাইফেল তুলে ধরলাম, এতক্ষণ কোন হুঁস্ ছিল না। এ বীটেও চিতাটা রয়েছে, কিছুক্ষণ পূর্বে বীটারদের চিৎকারে সে কথা বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি। হঠাৎ কি খেয়াল হলো রাইফেলের ব্রীচ্ ভেঙ্গে গুলি দুটো আর একবার দেখে নিলাম। বীটারদের অস্পষ্ট কথাবার্তা কানে আসছিল,

তারা তখন এত কাছে এসে গেছে। এমন সময় তার আবির্ভাব ঘটলো। নীরব-নিস্তব্ধ বন থেকে সরাসরি বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো দৃপ্ত ভঙ্গিতে। একবার ঘাড় বেঁকিয়ে বীটারদের আওয়াজ শুনলো, দূরত্ব তখন প্রায় দেড়শো গজের ওপর। তার পর মুখোমুখি দাঁড়ালো সামনের দিকে চেয়ে। আমার আর নড়বার জো রইলো না, তখনও রাইফেল তুলে নিশানা নিইনি, একেবারে কাঠ হয়ে বসে রইলাম।

প্রায় এক মিনিট থেকে দেড় মিনিট ধরে এমনি স্থির হয়ে রইলো সে, শরীরের একটা পেশীও নড়েনি। ধীরে ধীরে পা বাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। এক ফাঁকে রাইফেলটা তুলে ধরলাম, সে আর একবার মুখটা সরালেই রাইফেলের বাঁট কাঁধে ঠেকিয়ে নিশানা নেব—কিন্তু সে সুযোগ কিছুতেই আর আসছিল না। এমন সময় দু'জন বীটার একটা উঁচু পাথরের ওপর উঠে দাঁড়াতেই তাদের আমি দেখতে পেলাম, আর তারা দেখতে পেল চিতাকে। লোক দুটি যদি চুপচাপ নেমে দাঁড়াতো তো কি ঘটতো কিছু বলা যায় না, কিন্তু তারা তা করলো না। চিতাটা দেখা মাত্রই চিৎকার করে উঠলো, বাঘয়া-বাঘয়া……

বিদ্যুৎগতিতে চিতাটা তার নড়ানো থাবাটা গুটিয়ে নিল, তার পর এক ঝটকায় শরীরটা মুচড়ে বাঁ দিকের বনে লাফিয়ে পড়লো। ঝোপের আড়ালে আর তাকে দেখা গেল না, গুলি করবার সুযোগ এসেও এল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। এত দ্রুত দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়েছিল যে ভাষায় তার নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। একটা অব্যর্থ সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল, জানি না কার দোষে এমন সুযোগ হারালাম—বীটারদের, না আমার অদৃষ্টের!

বীটারদের সাড়া পেয়ে চিতাটা লাফিয়ে বাঁ দিকের বনে ঢুকেছে, সেদিকের শেষ স্টপার টুকান নামে সেই ছেলেটি, চূড়ামণির সাঙ। আমি রাইফেল তৈরী রেখে ঠক্‌ঠক্ শব্দ শোনার আশায় কান পেতে রইলাম, টুকানের সাড়া পেয়ে বাঘটা নিশ্চয়ই এদিকেই আবার ফিরে আসবে। একটা সুযোগ নষ্ট হয়েছে, তার আর পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেব না। চূড়ামণি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ছটফট করতে লাগলো—সাঙ কি ঘুমিয়ে পড়েছে, না চিতাটাকে দেখতে পায়নি? আফশোসে জিভের চুক্‌চুক্ শব্দ করে উঠল। দেখতে দেখতে শ্বাস রোধ করা কয়েকটা মিনিট কেটে গেল, এত দেরী হওয়ার কোন কারণ নেই। যতই দেরী হতে লাগলো ততই উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে লাগলো, তবু গাছের ডাল ঠোকার সেই ঠক্‌ঠক্ শব্দ

হলো না। সমস্ত জঙ্গল তখন আড়ষ্ট হয়ে ছিল। চিতাটা দেখার পর বীটাররা সেই যে মুখ বন্ধ করে লুকিয়ে রয়েছে, কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না, ভয়ে এক পাও আর অগ্রসর হয়নি। কোথাও এতটুকু শব্দ ছিল না, যে কোন মুহূর্তে চিতাটা ফিরে আসতে পারে—রাইফেল বাগিয়ে রয়েছি, যদি সে পলকের মধ্যে ছুটে আসে! পলে পলে, মুহূর্তে মুহূর্তে সময়ের কাঁটা যেন লড়াই করতে করতে এগিয়ে চলেছে। চিতার আশা ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে গেল। আকাশের আলো ম্লান হয়ে গেল, নেমে এল অবসাদ—নৈরাশ্য আর ব্যর্থতার এক অব্যক্ত জ্বালা……।

তার পর এক সময় সব উৎকণ্ঠার অবসান ঘটলো, বীটাররা একে একে এসে জড় হলো। তৃতীয় বিটের সমাপ্তি ঘটলো এইভাবে। সকলেই তখন ফিরে এসে তুমুল হট্টগোল বাধিয়ে দিয়েছে, ব্যর্থতার সব দায়দায়িত্ব গিয়ে পড়লো স্টপার টুকানের ঘাড়ে। মাতব্বররা হৈ-হৈ করে ছুটলো টুকানকে গাছ থেকে টেনে নামাবার জন্য। লক্ষ্য করলাম, সেই ভীড়ের মধ্যে টুকান নেই, বেচারা হয়তো ভয়ে গাছ থেকে নামতেই সাহস পায়নি।

তার পর চললো জেরার পর জেরা। উত্তেজনায়, রাগে সকলেই তখন ফেটে পড়েছে, গাল-মন্দের আর অন্ত রইলো না। চূড়ামণি, হলধররা তখন আমার পাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল, টুকানের অবস্থা তখন চরমে পৌঁছিয়েছে। বেচারী টুকান—সেই যে মাথা হেঁট্ হয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো—এত ধাক্কাধাক্কি, এত টানা-হেঁচড়া এমন কি চড়-চাপড় খেয়েও যেমন টুঁ শব্দটি করলো না, তেমনি প্রতিবাদের কোন ভাষাও তার বোবা মুখ দিয়ে নির্গত হলো না। যদিও একটা দারুণ সুযোগ তার দোষে নষ্ট হয়েছে, তবু তার এ-হেন হেনস্তা দেখে কেমন মায়া হলো। ক্ষেতের ধারে কোদাল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা সেই হাসি-হাসি মুখটার কথা মনে পড়ছিল!

বাকৃলা গ্রামের একজন মাতব্বর বললো—এই অপদার্থটার জন্য আপনার অনেক হয়রাণি হলো, বাবু—মাফ্ করো! অপদার্থ ছেলেটা তখন আমার সামনে লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছিল।

এর পর আর বীট (হাঁকোয়া) হয়নি। আমি যথারীতি জঙ্গলে টহল দিতে দিতে চিন্তা করলাম—আর তিন-চার দিন বড় জোর সম্ভব, তার পরেই আমাকে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু চিতাটার আর কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। অন্ধকারাচ্ছন্ন বাকৃলার গ্রাম, বন-প্রান্তর, অরণ্যসঙ্কুল পাহাড় এক আশ্চর্য নৈশ

স্তব্ধতায় ডুবে রইলো, কোন অস্বাভাবিক বা উত্তেজিত শব্দ আর তাকে ব্যাহত করলো না। বাক্‌লার দিন-রাত্রি হঠাৎ আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলো।.

আমি পাক্‌দণ্ডি পার হয়ে আর এক কারণে ক্ষেতের ধারে প্রায়ই এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতাম। চূড়ামণি একদিন বললো—সাঙ পাগল হয়ে যাবে, হাঁকোয়ার লাঞ্ছনা এখনও সে সামলাতে পারেনি, কেমন গুম্ হয়ে রয়েছে। দু-হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে লজ্জায় বসে থাকে, কোন কথার জবাব দেয় না—কাজেও বের হয় না।

টুকানের টঙটা প্রথম দর্শনেই পছন্দ হয়েছিল, ঠিক করেছিলাম এক রাত্রে চুপি চুপি এসে বসবো। টুকান আর টঙে আসে না, ফসলও পাহারা দেয় না। মনে মনে ভেবেছিলাম যখন সে টঙে বসে ফসল পাহারা দিত তখন কোন বাঁশীর সুর শুনেছে কি না! কিন্তু সে সুযোগ আর হলো না। আমি ঠিক জানি মর্মাহত ছেলেটা আমার সামনে কিছুতেই আর আসবে না। জংলী কানুনে কাপুরুষদের কোন ঠাঁই নেই। টুকান কি ব্যথায় এমন মর্মাহত, কার ধুলো-মাখা লঘু পায়ে সেদিন হরিণীর ছন্দ নেমে এসেছিল—ওষ্ঠে মোহিনীর বাঁশী বেজেছিল, আমি তার কি জানি! সেদিন কালো পাথরের সেই চাতালটায় বসে সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে শুধু দেখেছিলাম—বদ্ধ জলার গুমোট ভেঙ্গে হঠাৎ চৈতি বাতাস বইতে শুরু করেছিল, শাখাশ্রয়ী তরুলতায় নাম-না-জানা গন্ধহীন ফুল ফুটেছিল।

ক্রমশই রাত বাড়তে লাগলো, গ্রামের সাড়াশব্দ অনেক আগেই থেমে গেছে। তখনও চাঁদ ওঠেনি, তার দেখা পাবো সেই শেষ রাত্রে—ক্ষয়িষ্ণু চাঁদকে তখন কি করুণই না দেখায়! নীরব নিস্পন্দ অরণ্য, চতুর্দিকে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। মাঝে মাঝে জোনাকীরা আলো দপদপিয়ে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল, কালো মখমলের ওপর যেন সবুজ চুম্‌কি জ্বলছে নিভছে। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই, তবু দু-কানের মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ শব্দ কে যেন একনাগাড়ে বাজিয়ে চলেছে। টুকানের টঙে চুপি চুপি এসে বসেছিলাম, চূড়ামণিকেও কিছু জানাই নি।

এমন সময় অনেক দূর থেকে সেই নেকড়েটা হঠাৎ সুর করে কেঁদে উঠলো। ক্ষুধার্ত নেকড়ের ডাক দূর থেকে কান্নার মত শোনায়। মুখ বাড়িয়ে টঙের নীচের অন্ধকার ঝোপ-জঙ্গলের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। কত রাত কত জঙ্গলে কাটিয়েছি, কিন্তু টুকানের টঙে সময় যেন আর কাটতে চায় না, কেমন যেন হাঁফিয়ে উঠলাম। এমন নিষ্ক্রিয় হয়ে, আড়ষ্ট হয়েই বা কতক্ষণ থাকা যায়! সেই হাঁকোয়ার পর থেকে চিতাটা আর গ্রামে হানা দিতে আসেনি।

নিরুপদ্রবে বাক্‌লাবাসীরা রাত কাটাচ্ছে, পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে টঙের এক কোণায় অগ্নিসংযোগ করে দুহাতের আড়ালে গোপনে টানতে লাগলাম। অন্ধকার রাত ক্ষয়গ্রস্ত রুগীর মত তিলে তিলে হাল্কা হয়ে যাচ্ছিল, বোবা নিঃশব্দ রাত, কোথাও প্রাণের কোন স্পন্দন নেই। তবু সেই নৈশব্দেরও বুঝি ভাষা আছে—প্রকাশের অক্ষমতায় নিশুতি রাত সাঁ সাঁ করে কেটে যায়! শুকনো পাতার শব্দ হলো, হয়তো কোন পোকামাকড় নয় তো কোন সরীসৃপ তার ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে চলেছে। সেই ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে হঠাৎ প্যাঁচা ডেকে উঠলো—ক্যাঁ-ক্যাঁ, কচর্‌-কচর্‌, কচ্‌-কচ্‌-কচ্‌······।

তখন কত রাত জানি না, প্যাঁচার কর্কশ ডাকে যেন চম্‌কে উঠলো রাত্রি। আবার একবার অস্পষ্ট খস্‌ খস্‌ শব্দ ভেসে এল, মনে হলো—টুকানের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে কোন প্রাণী নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে, কিন্তু অন্ধকারের দরুন কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না। চতুর্দিকেই তখন ঘন অন্ধকার ছেয়ে ছিল। ঝোপ্‌-ঝাড়ের আড়ালে, গাছের গভীর ছায়ায় আর বনের সুঁড়ি পথের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার এত গভীর যে দৃষ্টি চলে না। মনে হয় এক অন্ধকার আর এক অন্ধকারের বুকে লুটিয়ে পড়ে কি আবেগে যেন ফুলে ফুলে উঠছে! দীর্ঘক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকলে চোখের পাতা ভারী হয়ে ওঠে, তখন 'নিজের চোখে দেখা'-র ওপর আর আস্থা রাখা যায় না! মনে হয়—কি যেন দেখলাম, কি যেন সরে গেল! তার কোন আকার-বিকার নেই। বিচিত্র অবয়বে, বিচিত্র ঢঙে অন্ধকার তখন অন্ধকারের বুকে খেলা করে······!

যে আশায় টুকানের টঙে এসে বসেছিলাম, তা পূর্ণ হলো কই! আমার হারিয়ে যাবার তো ভয় ছিল না, ভাবনা ছিল বাঁশী বাজবে তো! বনমোহিনীর বাঁশী সবাই নাকি শুনতে পায় না! রাত ক্রমশই ফুরিয়ে আসতে লাগলো, তবু না বাজলো বাঁশী—না এলো চিতা। শেষরাতের ভাঙ্গা চাঁদের আলো অস্পষ্ট কুয়াশার মত জড়িয়ে রইলো বনে। তবু যতটুকু দেখা যায় বার বার দেখতে লাগলাম, কিন্তু কোথাও কিচ্ছু নেই—নিঝুম রাত্রি স্তব্ধ হয়ে রয়েছে।

হঠাৎ উ-উ-উ করে কে ডেকে উঠল, কেঁদে উঠলোই বলা উচিৎ। এমন অপার্থিব ডাক কখনো শুনিনি। শব্দটা কোথায় হলো বুঝতে পারলাম না, তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিছু দেখতে পেলাম না। শব্দটা কেমন অদ্ভুত ধরনের, পূর্বে কখনো শুনেছি কি না স্মরণ করতে পারলাম না। দীর্ঘদিন বনে-জঙ্গলে ঘোরার দরুন প্রায় সব বড় জন্তুর ডাক আমি শুনেছি, কিন্তু সে ডাকের সঙ্গে এ ডাকের কোন

মিল নেই। ক্ষুধার্ত নেকড়ের কান্নাই বা বলি কেমন করে! কোন ছোটখাট জন্তু বা পাখীর ডাক হলেও হতে পারে! ভাম, গন্ধ-গোকুল, সজারু বা বজ্রকীটের ডাক কখনো শুনিনি, আর পাখীদের মধ্যে রাত্রে উ-উ-উ করে যে ডাকে, সে নিশ্চয়ই কোন নিশাচর পাখী! ভুঁই-প্যাঁচা, হুতুম্-প্যাঁচা বা গভীর রাত্রে বুড়ো শকুনের কান্না অথবা আর কোন অপরিচিত পাখী এমন শব্দ করে কি না জানি না। ক্ষুধার্ত নেউড়ী আদৌ এমন ডাক ডাকে কি না তাও অজানা। আমার এত সব জানা-অজানা সত্ত্বেও সেই অপরিচিত ডাকের কোন অর্থ খুঁজে পেলাম না। সুতরাং বনমোহিনীর সঙ্গে এই শব্দকে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না! জংলীদের বনমোহিনী কি—তা আজও আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না। সব চাঁদের আলোয় বনমোহিনীর অভিসার হয়তো হয় না, হয়তো তার আসার বিশেষ কোন তিথি-লগ্ন আছে—হয়তো বা কিছুই নেই! সে আসে মেঘের উজ্জ্বল স্তর থেকে, আলোর রজতধারায় শুভ্র ওড়না উড়িয়ে জ্যোৎস্নার স্রোত বেয়ে! উদাস মুগ্ধ অরণ্য আলোর সেই যাদুস্পর্শে শিহরণে কম্পিত হয়, পাতায় নিবিড় স্বপ্নের ঘুমুর বেজে ওঠে—সে আসে কাশের বনে, রূপালী ঝর্ণার স্রোতে ছায়াহীন, কায়াহীন আলোর আশ্চর্য উত্তরীয় উড়িয়ে। নিসর্গের সেই হাটে—বন-পাহাড়-ঝর্ণা মুগ্ধ বিস্ময়ে সহসা যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠতে চায়। কি ভাষায় কথা কয়, কি সুর বেজে ওঠে অঙ্কুরে মহীরুহে ফুলের পরাগে, সৃষ্টির সেই মোহিনী রহস্য প্রকৃতিই জানে! উষার আলো ফুটে উঠতেই নেমে এলাম টঙ থেকে, আর এক নিস্ফল রাত্রি কেটে গেল—না বাজলো বাঁশী, না এলো আমার ঈপ্সিত শিকার—চিতা। আমার ধ্যান-ধারণার বাস্তব মোহিনী, এমন মোহিনী মূর্তি অরণ্যে সত্যই বিরল!

টুকানের টঙে পর পর তিন রাত্রি বসেছিলাম। প্রথম রাত্রে একটা নেকড়ে ডেকেছিল, তার পর প্যাঁচা ও সবশেষে উ-উ-উ করে কোন ছোটখাট জন্তু বা কোন অপরিচিত নিশাচর পাখী ডেকে উঠেছিল, এ-ছাড়া বলার মত আর কিছু ঘটেনি। দ্বিতীয় রাত্রি আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যে কেটে গেল—উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটলো না। আর—তৃতীয় রাত্রিও ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কাটতে লাগলো। শেষ রাতে চাঁদ দেখা দিতে একটু নড়েচড়ে বসলাম। গুলিভরা রাইফেল পাশে রাখা ছিল।

এমন সময় খুট্ করে একটা শব্দ হঠাৎ কানে এল, তখন ভোর হতে বিশেষ বিলম্ব ছিল না। রাত জাগার ক্লান্তি নিয়ে চোখ নিচু করে ইতস্তত তাকাতে

গিয়েই চমকে উঠলাম। কি দেখলাম যেন বিশ্বাস হলো না! মোহিনী নয়, বাঁশী নয়—সেই চিতাটা কোথা থেকে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে! অরণ্যে যা সব-থেকে বাস্তব, যাকে আমি দীর্ঘদিন ধরে খুঁজেছি। সে এল এমন এক মুহূর্তে, যখন আমি তার আশা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেছিলাম এবং সেই মুহূর্তে আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। টুকানের টঙে সেই আমার শেষ রাত, এমন সময় সে হঠাৎ এসে দেখা দিল। মহুয়া গাছের নীচ দিয়ে তার পথ, টুকানের টঙের নীচে কেন হঠাৎ এল, কে জানে—!

বাঘ শিকারে ভাগ্যের কথা সর্বজনবিদিত, ভাগ্যের সেই সিংহদ্বার যেন একেবারে দু-হাট্ হয়ে খুলে গেল। অপ্রত্যাশিত মুহূর্তটিকে স্বাগত জানাতে রাইফেলটাকে তুলে নিতে এক সেকেণ্ডও আর দ্বিধা করলাম না। নিঃশব্দে নিশানা নিয়ে ঘোড়া টিপে দিলাম।

এই চিতার জন্য বেচারা টুকানকে কত লাঞ্ছনাই না সহ্য করতে হয়েছে। অথচ তারই টঙের নীচে চিতাটা মারা পড়লো। মন চাইলো—এখুনি ছুটে গিয়ে টুকানকে খবরটা দিয়ে আসি। তবু টুকানের কাছে যাওয়া হলো না, আমি জানতাম না তার ঘর কোথায়।

চিতাটা এত সহজে মরবে আশা করিনি। সে অনেক শয়তানী খেলা খেলেছে, অনেক অসম্ভব কাণ্ড ঘটিয়েছে, কিন্তু মৃত্যুবরণ করলো ঠিক অভিমানীর মত, যেন স্বেচ্ছায় গলা বাড়িয়ে দিল। গুলিটা লাগতেই শূন্যে লাফিয়ে উঠে আছড়ে পড়লো মাটিতে, তার পর ধড়ফড় করতে করতে এক সময় স্থির হয়ে গেল। চোখের তারা উল্টে গেল, যেন দুনিয়ার ভাল মন্দের ব্যাপারে শেষ হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে হাত ধুয়ে ফেলেছে। ভোরের আলো ফুটে উঠতেই টঙ থেকে নেমে এলাম, প্রায় পাঁচ-সাড়ে-পাঁচ ফুট লম্বা হবে। লক্ষ্য করলাম চার-শো গ্রেনের সফট্-নোজ গুলিটা কাঁধের জোড়ের মধ্যে ঢুকে গেছে। বুলেটের গভীর গর্ত থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত বেরিয়ে আসছিল।

দুর্গাপুর-ব্লকে ফিরে এসে চূড়ামণিকে ঘুম থেকে টেনে তুলে বললাম—টুকানের টঙের নীচে চিতাটাকে শেষ রাত্রে মেরেছি, তাকে তুলে আনতে হবে আর টুকানকেও খবর দিতে হবে, সে যেন অতি-অবশ্য আমার সঙ্গে একবার দেখা করে।

বাংলোয় যখন ফিরে এলাম, তখন সূর্য সবে পূর্বাকাশে প্রথম আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। আমার জিনিসপত্র সব বাঁধা-ছাঁদা, আটটার বাসে ফিরে আসব।

মালী ফ্লাস্কে চা ভরে রেখেছিল, কাপের পর কাপ ঢেলে খেতে খেতে আধ-লিটারের ফ্লাস্কটা কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। এমন সময় শুনতে পেলাম নীচের গ্রামে কিসের যেন সাড়া পড়ে গেছে, দলে দলে লোকজন পাক্‌দণ্ডির দিকে চলেছে। ভাবলাম, মরা চিতাটাকেই বোধ হয় দেখতে যাচ্ছে। এমন সময় একটা পনেরো-ষোল বছরের ছেলে দৌড়ে এসে আমাকে খবর দিল যে, চূড়ামণি-হলধররা আমায় ডাকছে। চূড়ামণি বা হলধর যে-কোন কারণেই হোক্ কখন আমায় ডেকে পাঠাতে সাহস করেনি। আজ হঠাৎ ডেকে পাঠালো কেন, কিছুটা অবাক হ'লাম বৈকি! পরক্ষণেই ভাবলাম—নিশ্চয়ই এমন জরুরী কিছু ঘটেছে যার গুরুত্ব অনেক এবং হয়তো কোন গত্যন্তর ছিল না।

রাইফেল না নিয়েই ছেলেটির সঙ্গে দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। পাক্‌দণ্ডি বেয়ে টঙের দিকে গিয়ে ছেলেটি আমায় জঙ্গলের দিকে নিয়ে চললো। আমি বললাম, চিতাটা এই দিকে মারা পড়েছে। ছেলেটি উত্তর দিল—জানি, চূড়ামণি এই দিকে ডাকছে বলে হন্‌হন্ করে হাঁটতে লাগলো। আমার মনে তখন দুশ্চিন্তার পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে, জঙ্গলে আবার কি হলো!

চিতাটাকে তো মরাই দেখে এসেছিলাম, সে কি আবার বেঁচে উঠে জঙ্গলে ফিরে গেছে এবং কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসেছে! কথায় বলে বিড়ালের মত বাঘেরও ন'টা প্রাণ, গুলি-খাওয়া বাঘ মড়ার মত পড়ে থাকার পরও জঙ্গলে ফিরে গেছে, এমন নজীরের কিন্তু অভাব নেই। এ-ক্ষেত্রেও কি সে-রকম কোন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো! রাইফেল না নিয়ে জঙ্গলে আসায় হঠাৎ নিজের ওপর রাগ হলো, এখন বাঘটাকে যদি জ্যান্ত দেখি তো লোকজনদের কাছে আর মুখ দেখানো যাবে না।

জঙ্গলের পথে ঘুরতে ঘুরতে জলার ধারে এসে পৌঁছলাম। কিছুদূরে একদল গ্রামবাসী চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। ব্যাপার কি—কিছুই আঁচ করতে পারছিলাম না। ভীড় ঠেলে এগিয়ে যেতেই কালো পাথরের সেই চাতালটা চোখে পড়লো, যেখানে বসে একদিন সিগারেট খেয়েছিলুম, আর—

হঠাৎ দেখতে পেলাম সেই চাতালটার নীচে মুখ থুবড়ে কে পড়ে রয়েছে, —আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠলো। নিশ্চয় গুলি-খাওয়া সেই চিতার কাজ, চিতাটা তাহলে মরেনি, অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে জখমের যন্ত্রণায় পালাবার সময় দৈবাৎ কোন গ্রামবাসী তার সামনে পড়ে গিয়েছিল, আক্রোশে মানুষটাকে খতম করে দিয়েছে। এখন সেই গ্রামবাসীর মৃত্যুর জন্য আমাকে

দায়ী করা হবে এবং যতদিন না চিতাটার মৃত্যু হয়, ততদিন রাইফেল ঘাড়ে ভুগে মরতে হবে পাহাড় জঙ্গল হাতড়ে-হাতড়ে!

গ্রামবাসীরা আমায় দেখতে পেয়েও কিন্তু কিছু বললো না, শুধু সরে গিয়ে পথ করে দিল। মরা-মানুষটার দিকে গভীর উৎকণ্ঠায় তাকিয়ে ছিলাম, এমন সময় হলধর কোথা থেকে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। তাকে তখন ভীষণ দেখাচ্ছিল—কালো দেহের সর্বাঙ্গ বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছিল, উত্তেজনায় দু-চোখের রক্তবর্ণে যেন ঘূর্ণী উঠছিল। আমি লজ্জায় তার মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। আমি জানি—সে এখুনি হাউ-মাউ করে কেঁদে সব অভিযোগ আমার মাথায় তুলে দেবে, আর গ্রামবাসীরা ভৎ'সনার নীরব দৃষ্টি মেলে ঘাড় নেড়ে নেড়ে সে অভিযোগে সায় দেবে। এই কথা ভেবে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত যখন কেঁপে উঠলো, তখনই হলধর বলে উঠলো—দেখ বাবু, মোহিনী বিশ্বাস করো না—দেখ মোহিনীর খেলা! একদম খতম করে দিয়েছে। তখনও সংশয় কাটেনি, ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে তাকালাম। মনে পড়লো—বাকৃলার সেই শিকারী একদিন গল্প বলেছিল, মোহিনী বাঘের রূপ ধরে রাখালকে মেরেছিল। যতই অসম্ভব—অবাস্তব হোক্—তবু মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে কথাটা যেন সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তাছাড়া এতদিন পরে চিতাটা টুকানের টঙের নীচেই বা হঠাৎ এসেছিল কেন! হলধরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে একটা কথা বেরিয়ে গেল, ও কে? কিসেই বা মারা পড়লো? আমার উত্তেজনা তখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল, চিতার সম্বন্ধে অসম্ভব কিছু শুনবো ভেবে—।

হলধর জবাবে যা বললো, আমি তার জন্য এক বিন্দুও তৈরী ছিলাম না। ভীষণ চমকে উঠলাম, যখন সে বললো—টুকান! মহানাগ খেয়েছে! হলধর বলতে লাগলো—সেই হাঁকোয়া থেকে টুকান লজ্জায় আর ঘরের বার হয় নি, কারুর সঙ্গে কথা বলে নি, এমন কি সম্-বৎসরের ফসল পাহারা দেবার জন্য টঙে পর্যন্ত যায় নি। অথচ দেখুন—ভয় নেই, ডর নেই রাতের অন্ধকারে কখন একা চলে এসেছিল এখানে, কেউ দেখেনি—কেউ জানতোও না। মোহিনী ডাকলে তাকে আসতেই হবে, তখন আর ভয়-ডর থাকে না, পূর্বাপর জ্ঞান থাকে না। দেখলা বাবু—মোহিনীর ডাক কত ভয়ঙ্কর!

মোহিনী ওকে ভুলিয়ে এনেছিল, নেশা ধরিয়েছিল আর সেই নেশার ঘোরে ঘোর হয়ে বাঁশী শুনিয়েছে মোহিনীকে সারা রাত ধরে। ওই দেখ সেই বাঁশী,

বলে আঙুল বাড়িয়ে জলার কাদায় পড়ে থাকা একটা বাঁশের বাঁশী দেখালো। আবার আমি চমকে উঠলাম, টুকান বাঁশী বাজায়! হলধর বলতে লাগলো, হাঁ বাবু, বাজায়। মোহিনী সেই বাঁশী শুনেছে রাত-ভোর, তবু তার তৃষ্ণা মেটেনি। বাঁশীর সুরে সুরে নৃত্য করেছিল মোহিনী বিভোর হয়ে। দেখ বাবু, বলে—সেই কাদায় কতকগুলো হিজিবিজি দাগ দেখালো। ছেদহীন সেই সুর নিশুতি রাতের নির্জন বনে তাকে পাগল করে তুলেছিল, কিন্তু মানুষের সাধ্য কি মোহিনীর তৃষ্ণা মেটায়!

হুঁস ছিল না কখন ভোর হয়ে আসছিল, কখন অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছিল—ফুঁসে উঠলো অতৃপ্ত আক্রোশে। সেই মত্ত দোলায় সহসা এসেছিল উন্মত্ততা, চোখের তারায় ঘন হয়েছিল ক্রূর নিষ্ঠুরতা। রাত তো অফুরন্ত নয়, দিগন্তে ফুটে উঠেছিল উষার স্নিগ্ধ ছটা।

সুরের ক্লান্ত রেশ তখনও বুঝি সঞ্চারিত হচ্ছিল ঘাসের নরম ডগায়, ভেসে বেড়াচ্ছিল ভোরের ঘুম পাড়ানী বাতাসে। আকাশের নিস্তেজ তারারা যখন হারিয়ে যাচ্ছিল আলোর গভীরে, পাখীদের ঘুম সবে ভেঙেছে—ঠিক তখনই হুঁস হলো। বিদ্যুতের বেগ নেমে এসেছিল মোহিনী অঙ্গে, ছায়ার মত দ্রুত মিলিয়ে গেল এক নিষ্ঠুর বিদায়-চুম্বন এঁকে দিয়ে—প্রদোষের অন্ধকার তখন দ্রুত অপসৃয়মান!

হলধর বললো, মহানাগ! কালো পাথরের সেই মস্ত চাতালের ওপর বসে থাকা টুকানের ঠিক ঘাড়ের নীচে ছোবল বসিয়েছে। মহানাগ ছাড়া অত উঁচুতে আর কেউ মাথা তুলতে পারে না। চাতাল থেকে গড়িয়ে জলার কাদায় মুখ থুব্‌ড়ে পড়েছিল টুকান! তার দেহের কালো রং আরও ঘোর, আরও বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল, কেউ সোজা করে তাকে শোয়াতে পারলো না—যেমন পড়েছিল তেমনিই পড়ে রইলো। দু-চোখের মরা-তারায় মোহিনী দেখার গভীর আতঙ্ক ফুটে রয়েছে।

লক্ষ্য করলাম ঠিক চিতার হাতের মত টুকানের ঘাড়ের নীচে মহানাগ শঙ্খচূড়ের বীভৎস রক্তাক্ত দংশন-ক্ষত দগ্‌দগ্‌ করছে। যা অন্যান্য সাপের কামড়ে দেখা যায় না। অন্যান্য বিষাক্ত সাপের কামড়ে বিষদাঁতের রক্তক্ষরা দুটি অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র সাধারণত চোখে পড়ে, অবশ্য চন্দ্রবোড়ার দংশনে সেই ক্ষতমুখ প্রসারিত হয়ে ঘায়ের মত দেখায়। কিন্তু শঙ্খচূড়ের ছোবল এত তীব্র যে কামড়ের সঙ্গে এক খণ্ড মাংস উঠে আসে, দগদগে ঘা প্রায় এক-ইঞ্চি থেকে

দেড়-ইঞ্চির মত বড় দেখায়। সেই সর্পরাজ ভয়ঙ্কর শঙ্খচূড়ের ছোবলে মুহূর্তের মধ্যে মরে কাঠ হয়ে গেছে টুকান।

শোনা ছিল বাঁশীর সুরে মুগ্ধ হয়ে সাপ ফণা দুলিয়ে নৃত্য করে, পল্লীগ্রামে অনেকেই সেই কারণে রাত্রে বাঁশী বাজায় না। হলধর বলেছিল, টুকানের বাঁশীতে মোহিনী ভর করেছিল, কাদায় পড়ে থাকা সেই অভিশপ্ত বাঁশী তখন নীরব হয়ে গেছে। এমন সময় চূড়ামণি এসে সঙের বাঁশীটা তুলে নিল, দেখলাম মহুয়া রসের আবেশে তার রাঙ্গা চোখের কোণে কখন জল নেমে এসেছে। কিছুদিন পূর্বে টুকানের টঙের কাছে একটা মস্ত বড় সাপ দেখেছিলাম জলার ধারে নেমে যাচ্ছিল। টুকান যখন টঙে বসে বাঁশী বাজাতো, হয়তো তখন থেকেই সাপটা ঘোরাফেরা করছিল। সবাই বলে—'বাঘের দেখা আর সাপের লেখা' কপালে থাকলে, তা নাকি খণ্ডন করা যায় না!

তবু সেই বিষণ্ণ প্রভাতের প্রথম সূর্যালোকে যথারীতি ঝলমলিয়ে উঠেছিল বন-প্রান্তর, ভোরের বাতাস এসে নিত্যদিনের মত ঘুম ভাঙ্গিয়েছিল বন-লতাদের ফুলেরা ঘুম্‌ঘুম চোখে সবে পাপড়ী মেলেছে। ঠিক আগের মত আবার পাখীরা গাছের ডালে, বনের কুঞ্জে উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগলো—কেউ ডাকছিল, কেউ শিস্ দিচ্ছিল। হরিয়ালের ঝাঁক পাতার ঘুলঘুলি থেকে উঁকি দিচ্ছিল, হলুদ রঙের ডানা মেলে গোলাপী ঠোঁটে ডেকে উঠলো বউ-কথা-কও পাখী। কোথাও কোন ব্যতিক্রম নেই—নির্লিপ্ত উদাসীন প্রকৃতির বুকে কোন অনুভূতি নেই, দুঃখও নেই! বাস্তব-অবাস্তবের সব দ্বন্দ্ব এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে ফুটে উঠেছিল প্রশান্ত, পরিচ্ছন্ন—প্রাণবন্ত সেই সকাল। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়েছিল সোনালী রোদ্দুর বনের সর্বত্র, এমন কি উপুড় হয়ে পড়ে থাকা কালো দেহের সেই দগদগে ক্ষতের ওপরও।

পিঁপড়ের একটা সারি এগিয়ে আসছিল ঘাসের-বন ঠেলে ঠেলে, রক্ত-ঝরা বুলেটের গর্তের মত হাঁ হয়ে থাকা সেই ক্ষতের গন্ধে। একজন মাতব্বর সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ফিস্ ফিস্ করে বললো—কি আশ্চর্য! টুকান ও চিতা প্রায় একই সময়ে মারা পড়লো! সরে এলাম সেখান থেকে, মাতব্বর ফিস্‌ফিস্ করে যা বলতে চেয়েছিল, তা যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ—আমার সায় না পেয়ে তখনকার মত থেমে গেলেও এতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে অসুবিধা হলো না—টুকানের মৃত্যুকে ঘিরে বৈচিত্র্যহীন, গতানুগতিক বন্যজীবনে উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের এক নব খোরাক জুটেছে। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের রহস্যময় অদৃশ্য

ঘুন-পোকারা মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সন্দেহ ও সংশয়ের যে বিষাক্ত দানা কাটতে শুরু করেছে, কোন যুক্তিতর্কের দ্বারাই তার নিরসন সম্ভব নয়। পাকদণ্ডি বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে এলাম। ফরেষ্ট-গার্ড, গ্রামসেবক ও তহশিলদার এখনও এসে পৌঁছয়নি, মাতব্বররা টুকানের সাপে-কাটা দেহটা ঘিরে অপেক্ষা করতে লাগলো।

অরণ্যের প্রবাদ—মোহিনী যাকে ডেকে নিয়ে যায়, সে আর ফেরে না। নিয়তির মতই নাকি অমোঘ সেই ডাক…!

[জীবনের উজ্জ্বলতম দিনগুলি কখন কিভাবে বনে জঙ্গলে কেটে গেছে, তার কোন হিসেব রাখিনি। গভীর অরণ্যের কোলে কত নিঃসঙ্গ বিনিদ্র রজনীর শেষে চোখের সামনেই ঊষার কত আভা ফুটে উঠতে দেখেছি। নিরক্ষর, সরল অরণ্যবাসীদের কত অন্ধবিশ্বাস, কত কুসংস্কারের অলিখিত কত মর্মান্তিক ঘটনার নীরব সাক্ষী হয়েছি। দেখেছি—ঘটনা-পরম্পরায় এমন আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটেছে, যা বাস্তবের সুদৃঢ় ভিতকেও টলিয়ে দিতে দ্বিধা পর্যন্ত করেনি। যদিও আমি অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের স্বপক্ষে নিশ্চয়ই নই,—তবু কখনো কখনো এমন সব আশ্চর্য ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যার যুক্তিগ্রাহ্য কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি।

এমন আশ্চর্য মোহিনী রাত এসেছে—যা অনুভূতি দিয়ে হয়তো শুধু অনুভবই করা যায়, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বুদ্ধি-বিবেচনা, আত্মবিশ্বাস ও অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে সবলে কে যেন তখন নাড়া দিয়ে যায়। কখনো বনভূমি ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা, আবার কখন ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় মাখা। অজানা শিহরণে গায়ে কাঁটা দেওয়া নিঃসঙ্গ সেই ঘন রহস্য রাত কখন অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ করেছে, আবার কখন উত্তেজনায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে, তবু তারও অবসান ঘটেছে। বরভিয়ে ফুটে উঠেছে আলোয় ভরা দিন। দিবালোকের সন্তান আত্মপ্রত্যয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে।

তবু মনে হয়, নির্জন অরণ্যের বুকে গভীর নিরালায় কোন গোপন-গভীর থেকে এক অব্যক্ত অস্ফুট সুর ফুটে উঠতে চায়। সেই 'কোথায়' কোন ঠিক-ঠিকানা নেই, তার হদিস আজও পাইনি। জানি না—সে কত দূরে বা কত কাছে, চেনা-অচেনা সীমার কোন্ পারে। 'মনে বনে কোণে'—সে কোথায়, তাও জানি না!

যা কানে বাজে না, সংসারে সাজে না—অনুভূতির গভীরে কখন চমক্ দিয়ে যায় শুধু! জানি না, অলক্ষ্যে থেকে কোন্ মোহিনী সে বাঁশী বাজায়……!!]

—•—